তত্তোধিক

আলোর শেষ কণিকাটুকুও গেল মিলিয়ে। ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চরাচর। থেমে গেল বিশ্বের সমস্ত গান। যে-গান সুর সংগ্রহ করেছে কোটি কোটি মানুষের কলরব আর পাখির কলস্বর থেকে, বাতাসের দীর্ঘশ্বাস আর মর্মরিত অরণ্য থেকে, মহাসমুদ্রের গর্জন আর নদীর ঝিরিঝিরি থেকে; সুর সংগ্রহ করেছে গাড়ির শব্দ, যন্ত্রের শব্দ, মাটির গায়ে গাঁইতি শাবল আর লোহার গায়ে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ থেকে,—সে-গান আর কোনোদিন ওর কাছে সত্য হয়ে উঠবে না। ওর ঘুম ভাঙাতে পারবে না।

নির্বাণহীন এক বয়লারের উত্তাপে তরল হয়ে যাওয়া রুপোর স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে অনন্তকালের পৃথিবীর ওপর দিয়ে, সে-স্রোত হার মেনে মাথা হেঁট করল শুধু ওই ঘুমন্ত চোখজোড়ার কাছে।

অথচ এই কিছুক্ষণ আগেও আলোর জন্যে কী ব্যাকুল আকুতি ফুটে উঠেছিল ওর কণ্ঠস্বরে।

'জানলাটা খুলে দাও না, আলো আসুক।'

বিকৃত সেই স্বরটা একটা আর্তনাদের মতো আছড়ে পড়েছিল বাতাসের গায়ে, তার থেকে ঘরের মেঝেয়। অন্তত তাই মনে হয়েছিল কমলাক্ষর।

তারপর সেই শেষ একটা মোচড়।

'রাত্তির হয়ে গেল, আলো জ্বালছ না কেন?'

উঠতে চেষ্টা করেছিল, উঠতে পারেনি। আলোর জন্যে আকুলতাও করেনি আর। গত সন্ধ্যার মতো হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে খোঁজেনি—'কোথায় বসে আছ তুমি? আমি যে দেখতে পাচ্ছি না।'

কমলাক্ষ উঠে দাঁড়ালেন।

বসে থাকবার সময় নয়। এখন তো এই এতবড়ো বিপদের দায়িত্বটা সমস্ত নিতে হবে তাঁকে। উপায় কি, মানুষের চামড়া রয়েছে য়খন গায়ে। নিথর হয়ে যাওয়া মানুষটার দিকে তাকালেন একবার। অদ্ভুত রকমের অচেনা লাগছে।

কিন্তু অচেনা ছাড়াই বা কি? সাতটা দিন আগেও তো পৃথিবীর শত শত কোটি অদেখা লোকের দলেই ছিল ও। মাত্র কয়েকটা দিনের জন্যে এসে কী আশ্চর্য রকম জড়িয়ে পড়লেন, ভেবে অবাক লাগছে কমলাক্ষর।

বন্ধু নয়, আত্মীয় নয়, হোটেলওয়ালা। সম্পর্ক শুধু পয়সার লেনদেনে। তবু আর একটা হিসেবও রাখতে হয় বইকি। পৃথিবীর কাছেও একটা ঋণ থাকে যে মানুষের। মানুষ হয়ে জন্মানোর ঋণ।

কমলাক্ষ বিছানার পাশের টুলটা ছেড়ে উঠলেন। সদ্যমৃতের মাথার কাছে প্রায় মৃতের মতোই নিথর হয়ে বসেছিল যে-মানুষটা, তাকে উদ্দেশ করে আস্তে প্রায় অস্ফুটে বললেন, 'কোথায় কোথায় টেলিগ্রাম করতে হবে, তার ঠিকানাটা—'

পাথরের দেহে সাড়া জাগল না, শুধু পাথরের মুখে স্বর ফুটল, 'কোথাও না।'— একটা যান্ত্রিক স্বরে উচ্চারিত হল কথাটা।

'কোথাও না। মানে আপনাদের আত্মীয়স্বজনদের—'

যন্ত্রের মধ্য থেকে যন্ত্রের শব্দের মতোই ভাবহীন, আবেগহীন, নিতান্ত নির্লিপ্ত উত্তরটা কমলাক্ষকে বিমূঢ় করে দেয়। 'আমাদের কোনো আত্মীয় নেই।'

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কমলাক্ষ, সত্যিই বিমূঢ় হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

এরপর আর কোন্ প্রশ্ন করবেন?

তবু তো করতেই হবে। নইলে কী করবেন? একটা কোনো ব্যবস্থা তো করা চাই।

'এখানে কোনো কেউ চেনাশোনা—'

'এখানে?' পাথরের প্রতিমা মুখ তুলল এবার। বুঝি বা একটু হাসলই। তারপর বলল, 'এখানের বাসিন্দারা কেউ আমাদের মুখ দেখে না। শুধু আপনাদের মতো এই বাইরের বোর্ডারদের নিয়েই দিন চলে যায় আমাদের।' হঠাৎ আর একটু সত্যি হাসিই হাসল বোধ হয় ও। বলল, 'মানে চলে যেত।'

চলে যেত!

এরপর আর কিভাবে দিন চলবে, আদৌ চলবে কি না—সে-কথা জানা নেই ওর। কমলাক্ষ এই সাত দিনেও যার নাম জানেননি, জানবার চেষ্টাও করেননি। জানা দরকার একথা ভাবেনইনি।

এখনও ভাবলেন না। শুধু ভাবলেন, তাই তো! আমি কেবলমাত্র এদের 'প্রবাস বোর্ডিঙের' বাইরের বোর্ডার, তা ছাড়া আর কি?

কমলাক্ষ কি তবে এদের বিপদ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না? কমলাক্ষ এ-ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘর থেকে সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে সোজা স্টেশনে চলে যাবেন? সম্ভব নয়?

একেবারে অসম্ভব? কমলাক্ষ তো জীবনে আর কখনও এই পলাশপুরে আসবেন না। ওই যে মানুষটা সম্পূর্ণ ভাবলেশশূন্য মুখ নিয়ে যান্ত্রিক স্বরে শুধু জানিয়ে দিল, ওদের কোনো আত্মীয় নেই, এখানে কেউ ওদের মুখ দেখে না, কমলাক্ষকেও তো জীবনে কখনও আর তাকে মুখ দেখাতে হবে না।

তবে কেন এই অনাসৃষ্টি অদ্ভুত অবস্থাটার মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছেন কমলাক্ষ?

কেন দাঁড়াচ্ছেন, কেন দাঁড়াবেন, সেকথা ভাবতে পারলেন না কমলাক্ষ। দাঁড়াতে হবেই, এই চরম সিদ্ধান্তটা জেনে নিলেন। তাই খুব ধীরে বললেন, 'আমি তো এখানের কিছুই জানি না। কোনো সমিতি-টমিতি আছে কি?'

'সৎকার সমিতি' কথাটা মুখে বাধল। শুধু বললেন 'সমিতি'।

ও এবার বিছানার ধার থেকে উঠে এল। তেমনি কেমন এক রকম হাসির মতো করেই বলল, 'আছে কি না আমিও ঠিক জানি না, দরকার হয়নি তো—তবে আমি বলি কি—নিজেরাই কোনো রকমে—'

নিজেরা! মহিলাটি কি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেলেন নাকি?

স্পষ্ট সে-সন্দেহ প্রকাশ না করলেও বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলেন না কমলাক্ষ, বিস্ময়টা হয়তো বা একটু উত্তেজিতই হল। 'নিজেরা! নিজেরা মানে? বলছেন কি আপনি?'

মহিলাটির সর্বাঙ্গে এখনও সধবার ঐশ্বর্যরেখা, তবু ভয়ানক রকমের বিধবা বিধবা লাগছিল ওকে। ওর ঠোঁটের রেখায় যেন বালবিধবার শুষ্ক বিষণ্ণতা।

কমলাক্ষর মনে পড়ল ভদ্রমহিলা সেই পরশু সকাল থেকে এই দুদিন রোগীর বিছানা ছেড়ে ওঠেননি, জলবিন্দুটি পর্যন্ত মুখে দেননি। পুরো দু'রাত ঘুমোননি। তার ওপর এই দুর্ঘটনা। শুকনো তো লাগবেই।

কমলাক্ষ চোখ নামালেন। একটু বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা হল মনে হচ্ছে।

মহিলাটি অবশ্য কমলাক্ষর ওই দৃষ্টি আর দৃষ্টি নামানোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন না। নিতান্ত সহজভাবেই উত্তরটা দিলেন, 'তা ছাড়া আর কোনো উপায়ও তো দেখছি না। শ্মশান শুনেছি এখান থেকে বেশি দূর নয়। আমি আছি, করুণাপদ আছে, আর—' প্রায় স্পষ্টই হেসে উঠল ও এবার, 'আর আপনি তো আছেনই। আপনি তো আর চলে যেতে পারছেন না? তিনজন মিলে যা-হোক করে—'

'আচ্ছা আপনাদের এখানের লোকগুলো কী' কমলাক্ষ এবার বিস্ময়ের সঙ্গে একটু বিরক্তি প্রকাশ না করে পারেন না। 'মানুষ না জানোয়ার? এই রকম একটা বিপদের সময়ও—'

'এই রকম একটা বিপদই তো এই দীর্ঘকাল ধরে চাইছিল ওরা। চাইছিল অথচ পাচ্ছিল না, কত হতাশায় ছিল! এতদিনে যদি 'দিন' পেয়েছে তার সদ্ব্যবহার করবে না?'

কমলাক্ষ একটুক্ষণ থেমে থাকেন। থেমে থেমে বলেন, 'জানি না এমন একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার কারণটা কি আপনাদের! জানতে চেয়ে বিব্রত করতেও চাই না, শুধু বলছি—আপনার ওই সমস্যা-সমাধানের প্রস্তাবটা বাস্তব নয়। থাক ও নিয়ে আপনি আর মাথা ঘামাবেন না, আমি বেরচ্ছি, যা হয় একটা ব্যবস্থা হবেই। কেবল আপনার ওই করুণাপদকে বলবেন, কোথাও থেকে কিছু ফুল যদি জোগাড় করে আনতে—'

'ফুল! ওঁর জন্যে ফুলের কথা বলছেন?'

এতক্ষণের ভাবশূন্য সাদাটে মুখটায় হঠাৎ যেন এক ঝাঁক রক্তকণিকা এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, ঠেলাঠেলি করে।

কমলাক্ষ আর একবার চোখ নামান। শান্ত স্বরে বলেন, 'মৃতকে আর কি দিয়ে সম্মান জানানো যায় বলুন? পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার কালে এইটুকুই তো তার শেষ পাওনা?'

নাঃ, বাসিন্দা এখানে খুব বেশি নেই। দু'চারজন রিটায়ার্ড ভদ্রলোক এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন। হয়তো বা সস্ত্রীক, হয়তো বা একা। একারা বিপত্নীক কি সংসার-বিদ্বেষী সেকথা বলা শক্ত। অবসর গ্রহণের পর স্ত্রী-পুত্র-সংসারের সঙ্গে কিছুতেই বনে না, এমন লোকের সংখ্যা সংসারে বিরল নয়। হয়তো অমনোমত খাওয়া-দাওয়া নিয়ে হয়তো বা সংসারের খরচ-পত্রের প্রশ্ন নিয়ে। রিটায়ার করলে যে টাকা কমে যায়, সে-সত্যটা মানতে রাজী নয় অনেক মহিলাই।

তেমনি বাড়ির কর্তারা মাঝে মাঝে বেশ কিছুদিন করে বসবাস করে যান এখানে সুসময়ের তৈরি ইটকাঠের আশ্রয়টুকুর মধ্যে।

বাড়িগুলো সারানো আর হয়ে ওঠে না, দেওয়ালগুলো বালি ঝরা, রেলিঙগুলো মরচে ধরা, কার্নিশের কোণ ভাঙা, একদার ফুলবাগান শুকনো আগাছার জঞ্জাল, তবু তার মধ্যেই বেশ কাটান তাঁরা। কোনো একটা যাহোক মতো দেহাতি চাকর জোগাড় করে, তাকে দিয়ে দু'বেলা মুরগির ঝোল আর ভাত রাঁধিয়ে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করেন, আর লাঠি একগাছা হাতে নিয়ে দুবেলা শহর প্রদক্ষিণ করে বেড়ান। আর সেই সূত্রে শহরে যে যেখানে আছে তাদের নাড়ির আর হাঁড়ির খবর নিয়ে বেড়ান।

অবশ্য এমনটা খুব বেশি সংখ্যায় নেই। সস্ত্রীকই আছেন অনেকে। ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে গেছে, যে যার পথ দেখেছে, শেষ জীবন পরস্পরে পরস্পরের আশ্রয় হয়ে মফঃস্বলের বাড়িটিতে এসে বাস করেছেন। তাঁদের সংসারে অবশ্য লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, ইতু, ঘেঁটু থেকে শুরু করে মোচার ঘণ্ট, কচুর শাক, গোটাসিদ্ধ পর্যন্ত কিছুরই ত্রুটি নেই। তবে সময়েরও অভাব নেই। তাঁরাও অপরের জীবনের নিভৃতে উঁকি না দিয়ে পারেন না।

না করলে কি নিয়ে থাকবে? কর্মহীন জীবনকে উপভোগ করতে ক'জন জানে? ক'জন শিখেছে সে-আর্ট?

তা এ ছাড়া আর যত বাড়ি সবই প্রায় পড়ে থাকে বুকে এক-একটা ভারী তালা ঝুলিয়ে। পাছে জানলা-দরজাগুলো কেউ খুলে নিয়ে যায়, তাই নামকা ওয়াস্তে একটা করে 'মালি' নামধারী ফাঁকিবাজ ব্যক্তি থাকে। ছুটিছাটায় কখনও বাড়ির লোকেরা বাড়িতে এলে তবে তাকে বাড়ির ধারে কাছে দেখতে পাওয়া যায়। তখন সে ঘাস চাঁছে ভাঙা বেড়ার দড়ি বাঁধে, দেয়ালের উই ভাঙে।

পুজোয় সময় জায়গাটা ভরে ওঠে, রঙে লাবণ্যে কলরবে।

'প্রবাস বোর্ডিঙে'ও সে সময় চাঞ্চল্য জাগে। সেই তো মরসুম। নইলে সারা বছরে কে কত চেঞ্জে আসে! কমলাক্ষর মতো কে আসে গরমের ছুটিতে!

তা যারা থাকে, তারা 'প্রবাস বোর্ডিঙের' মালিক মালিকানির সঙ্গে মুখ দেখাদেখি রাখে না কেন, এও তো একরহস্য!

শুধু যে মুখ দেখে না তা নয়, খদ্দেরও ভাঙায়। অন্তত ভাঙাতে চেষ্টা করে। সে-কথা মনে পড়ল কমলাক্ষর পথ চলতে চলতে।

বেশিদিনের কথা তো নয় যে ভুলে যাবেন। মাত্র সাতটা দিন আগেই তো।

পলাশপুর স্টেশনে নেমেছিলেন কমলাক্ষ সুটকেসটা আর বেডিংটা নিয়ে। কলকাতা থেকে একটা বাড়ি মাসখানেকের জন্যে ভাড়ার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন, মনটা তাই বড়ো নিশ্চিন্ত আর খুশি-খুশি ছিল। গরমের ছুটির একটা মাস থেকে যাবেন এখানে। সেই একটা মাসে কলেজের খাতা দেখা থাকবে না, ঝামেলা থাকবে না। শুধু খাবেন ঘুমাবেন আর বই পড়বেন।

পড়া তো হয় না। কত ভালো ভালো বই নীরব অভিযোগের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে কমলাক্ষর দিকে, যেন বলতে চায় মলাটটা পর্যন্ত ওলটাবার যদি সময় নেই তোমারি, কেন তবে কিনেছ আমাদের? কেন বন্দী করে রেখেছ তোমার শেলফের খাঁজে খাঁজে?

ওরা ঠিক টের পায় কমলাক্ষর অন্তরাত্মা কতখানি তৃষিত হয়ে থাকে, শুধু মলাট ওলটানো নয়, একেবারে ওদের ঘরের দরজা খুলে অন্তঃপুরে ঢুকে পড়ার জন্যে?

কিন্তু কোথায় সেই সময়?

কমলাক্ষর সমস্ত অবসরটুকু অবিরত টুকরো টুকরো করে কেড়ে নিয়ে চলেছে বন্ধুজন পরিজন, ব্যাগার খাটুনি, বাড়তি কাজ।

সুটকেসের সবটাই প্রায় বাছাই বাছাই বই ভরে নিয়ে চলে এসেছিলেন কমলাক্ষ। একজন বন্ধুর মাধ্যমে বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করে ফেলে। কলকাতা থেকেই বাড়ির চাবি দিয়ে দিয়েছে বাড়িওলা। তা ছাড়া আনন্দে বিগলিত আর বিনয়ে আনত হয়ে বলে দিয়েছে, 'সব আছে মশাই আমার বাড়িতে। চৌকী চেয়ার আনলা বালতি শিল-নেড়া—গেরস্তর যাবতীয় প্রয়োজন। তবু দেখুন ভাড়ায় আমি গলা কাটি না। নইলে উইথ ফার্নিচার বলে বিজ্ঞাপন লাগালে—যাক, গিয়ে দেখবেন—হ্যাঁ, অমুক বাবু ভাড়াটের সুবিধে অসুবিধে বোঝে কি না।'

তা বুঝেছিলেন কমলাক্ষ। হাড়ে হাড়েই বুঝেছিলেন।

স্টেশন থেকে সাইকেল রিকশাটাকে ঠিকানা বুঝিয়ে বুঝিয়ে আর নিজে তার কাছ থেকে পথ বুঝে বুঝে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে যখন ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছলেন, সূর্যদেব তখন টেবিলের ফাইল ঝেড়েঝুড়ে তোলবার তাল করছেন।

কমলাক্ষ তাড়াতাড়ি চাবি খুলে ফেলে অন্তত আলো জ্বালার ব্যবস্থাটা করে ফেলবেন ঠিক করে রিকশাটাকে দাঁড় করিয়ে তালায় চাবি লাগালেন।

কিন্তু দীর্ঘদিনের মরচে ধরার শোধ নিতেই বোধ করি তালা এবং চাবি অসহযোগিতা করে বসল। খুলতে পারলেন না কমলাক্ষ।

তবে চাবি খুলে তারপর ভিতরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে, এমন অসুবিধে ঘটিয়ে রাখেনি বাড়িওলা। এখানে সেখানে জানলার কপাট সপাটে খুলে নামিয়ে রেখেছে বুদ্ধি করে।

হাঁ-করা সেই জানলার ফোকরে চোখ ফেলে দেখতে পেলেন কমলাক্ষ, মানে ঝুল আর মাকড়সার জালের জাল ভেদ করে যেটুকু চোখে পড়ল তা এই—তিনটে পায়ায় ইট লাগানো একপেয়ে একটা আটফাটা চৌকির ওপরে রড়্ভাঙা আলনার স্ট্যান্ড দাঁড় করানো, তার তারই পাশে মরচেয় কালো হয়ে যাওয়া একটা বালতি উপুড় করা।

ব্যস্। আর কোথাও কিছু না।

অথবা যদিও কিছু থাকে, যথা—জলের কলসী, শিল-নোড়া, মাকড়সার জালের আচ্ছাদন ছিন্ন করে সেগুলি আর কমলাক্ষর দৃষ্টিতে ধরা দিল না।

'উইথ ফার্নিচার' এই বাড়ির চেহারা দেখে মিনিট কয়েক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কমলাক্ষ ফের রিকশায় উঠলেন। বললেন, 'চল, আবার স্টেশনে চল।'

রিকশাচালক বোধ করি অবস্থাটা অনুধাবন করতে পারে, তাই প্রশ্ন করে জেনে নয়, বাবুর কী উদ্দেশ্যে আগমন, এবং জানান দেয়, এই বাড়ির বাড়িওলাটা পয়লা নম্বরের জোচ্চোর। বহুৎ লোককে এই রকম তকলিফ দেয়।...তা বাবু যখন ছুটি নিয়ে চেঞ্জে এসেছেন, ফিরে কেন যাবেন? থাকবার জায়গার সন্ধান সে দিতে পারে।

'কেন? কোনো হোটেলওয়ালার দালাল বুঝি তুই?' প্রশ্ন করেছিলেন কমলাক্ষ।

লোকটা জিব কেটেছিল। সে সেরকম লোক নয়। আর সেই হোটেলের মালিকও দালাল রাখবার মতো লোক নয়। বাবু নেহাত বিপদে পড়েছে বলেই দয়ার্দ্র হৃদয়ে খবরটা দিচ্ছে সে। তা বাবু সেখানে যেতে চায়, কোনো বাঙালিবাবুর বাড়িতে নিয়ে গিয়েও উঠিয়ে দিতে পারে! বাঙালি দেখলে বাঙালিবাবুরা যত্ন করলেও করতে পারে।

নাঃ, বিনি পয়সার যত্নে কাজ নেই। ভেবেছিলেন কমলাক্ষ। তারপর বলেছিলেন, 'সে সব থাক। দেখি তোর বোর্ডিং হাউসটি কেমন!'

প্রথম ঝোঁকে পত্রপাঠ স্টেশনে ফিরে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও সত্যিই ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। এত তোড়জোড় করে আর এত আশা নিয়ে আসা!

তাছাড়া সংসারের লোকেরাই বা বলবে কি? কি বলবে বন্ধুজনেরা? কমলাক্ষ যে একটি রাম ঠকা ঠকেছেন, কমলাক্ষর গালে চড়টি মেরে যে আগাম এক মাসের ভাড়া আদায় করে নিয়ে ধুরন্ধর বাড়িওলা কমলাক্ষকে মর্তমান প্রদর্শন করেছে, এই খবরটা কি ঘোষণা করে বলে বেড়াবার মতো?

ফিরে গেলে ওই বোকা বনে যাওয়ার খবর তো ত্রিজগতে ঘোষিত হতে এক ঘণ্টাও সময় লাগবে না।

শহরের প্রায় একপ্রান্তে—'প্রবাস বোর্ডিঙের' সামনে যখন এসে দাঁড়ালেন কমলাক্ষ, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। বাইরের বারান্দায় একটা হ্যারিকেন জ্বেলে রাখা হয়েছে। বাইরের দিকে দেখা গেল না কাউকে।

সত্যি বলতে কি, চিরকেলে কলকাতার মানুষ কমলাক্ষর কাছে এই সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এই অন্ধকার বাড়ি, হ্যারিকেনের ছায়া-ছায়া আলো, খুব একটা প্রীতিকর হল না। বরং একটু ভয় ভয়ই করল।

কে জানে কি ধরনের জায়গা? রিকশাওলাটাই বা লোক কেমন? এরা কোনো চোর ডাকাত জাতীয় নয় তো? এইভাবে ফাঁদ পেতে—

আবার নিজের চিন্তায় নিজেই লজ্জিত হলেন। কি যা-তা ভাবছেন! কমলাক্ষর বাড়িওলা যদি এই মধুর ইয়ারকিটি না করত, কমলাক্ষ যদি বাড়ির তালা খুলে মালপত্র নিয়ে রিকশাওলাকে ছেড়ে দিতেন, কাকে ফাঁদে ফেলতে আসত সে?

মানুষের উপকারকে, মানুষের শুভেচ্ছাকে অবিশ্বাস করার মতো নীচতা আর কি আছে!

ডেকে দিয়েছিল রিকশাওলাই।

করুণাপদ বেরিয়ে এসেছিল। সাড়া পেয়ে। একাধারে যে এই বোর্ডিঙের চাকর পাচক হিসেবরক্ষক।

'কি চাই?' প্রশ্ন করেছিল করুণাপদ।

কমলাক্ষ সংক্ষেপে অবস্থা বিবৃত করে বলেছিলেন, 'এ তো আমাকে ধরে-করে নিয়ে এল এখানে। জায়গা আছে নাকি থাকার?'

সংকল্প করছিলেন অবশ্য, আজ রাতটা তো কাটাই, তারপর বোঝা যাবে সকাল হলে।

করুণাপদ বলল, 'আছে জায়গা। এই তো ব্যবসা বাবুর। তবে এই ভরা গরমে তো বড়ো একটা আসে না কেউ, তাই ঘর-দোর তেমন পরিষ্কার করা নেই। আজ্ঞে, মানে পরিষ্কারই আছে, সে তো মায়ের এক কণা ধুলো থাকবার জো নেই। তবে বিছানাপত্তরের জুতটা তেমন—'

'বিছানা আমার সঙ্গেই আছে।' বলেছিলেন কমলাক্ষ। ঈষৎ চিন্তাভাবনার মাঝখান থেকে।

কি বলল লোকটা? 'মায়ের।'

'মা' আবার কী বস্তু? হোটেলওয়ালীর হোটেল না কি? তা হলেই তো বিপদ গুরুতর। কিন্তু 'ও যে মা না কি বললে'—এটুকু জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা করল। বিছানার খবরে হৃষ্ট করুণাপদ বলল, 'বিছানা আছে? তবে আর কি! চলুন। ঘর দেখিয়ে দিই, জল তুলে দিই, হাত পা মুখ ধোবেন তো? বাবু একটু বেরিয়েছেন, এখুনি এসে যাবেন।'

'বাবু!' তবু ভালো!

কমলাক্ষ ভাবলেন, 'তবু এবারের যাত্রাটাই দেখছি অযাত্রা। এর থেকে বরাবরের মতো ছুটির দু'চারটে দিন পুরী-টুরিতে কাটিয়ে এলেই হত। বেশি লোভ করতে গিয়ে দেখছি সবটাই লোকসান।'

কর্তাটি আবার অনুপস্থিত। সে লোককে একবার দেখলেও তবু হোটেলের পদমর্যাদা সম্পর্কে একটু অবহিত হওয়া যেত। অবিশ্যি চাকরটা খুব খারাপ নয়। এর অনুপাতে কর্তা হলে ভালোই হবে আশা করা যায়।

আচ্ছা তা এইটুকু তো বাড়ি। এর মধ্যে আবার হোটেলের ব্যবসা চলে কি করে? নিজেরাও তো থাকে।

ভাবতে ভাবতে পৌঁছে গেলেন নির্দিষ্ট ঘরে। বাড়ির ভিতরকার দালান দিয়ে গিয়ে পিছন দিকে খানতিনেক ঘর, বাড়ির সঙ্গে ঠিক লাগোয়া নয়, একটু ছাড়া। এই তিনটি নিয়েই তা হলে হোটেলের লপচপানি!

করুণাপদ বোধ করি মুখের ভাষা পাঠ করতে পারে। তাই বিনীত কণ্ঠে বলে, 'হোটেল বলতে তেমন কিছু নয় বাবু, ওই বলতে হয় তাই বলা। হোটেল না বললে এখানকার হতচ্ছাড়া লোকগুলো যে বুঝতেই পারে না। রিকশাওলা বলুন, মুটে বলুন, দাই মালি যা বলুন, ওই হোটেল বললেই বোঝে ভালো। তাই পুরনো নাম উঠিয়ে দিয়ে এই 'প্রবাস বোর্ডিং' নাম দেওয়া। নইলে সাইনবোর্ড উলটে দেখবেন, ওপিঠে লেখা আছে 'প্রবাস-আবাস'। মায়ের নিজের দেওয়া নাম। যাক সেকথা বাবু, নামে আর কি করে! থেকে দেখুন ব্যবস্থা কেমন!...দেখুন মা-বাবু কেমন লোক!...মানে ব্যবসাদার তো আর নয়, নেহাত চলে না বলেই তাই—'

কমলাক্ষর এবার আর বুঝতে অসুবিধে হয় না।

কর্তা গিন্নি (খুব সম্ভবত নিঃসন্তান) দুজনে এই পরবাস আবাসে বাস করেন, এবং ওই তিনখানি ঘর থেকেই কিছু আয়-টায় করে চালান।

তা মন্দ নয়। নেহাত 'হোটেল হোটেল' হবে না। তবে বেশি গায়ে-পড়া আত্মীয়তা না করতে এলেই হল।

বাকি ঘর দু'খানা তো খালিই রয়েছে মনে হচ্ছে, তালা ঝুলছে দেখা যাচ্ছে। কেউ নেই, নাকি তালা দিয়ে বেড়াতে গেছে। ওঃ না, চাকরটা যে বলল এসময় কেউ আসে না, যাক বাঁচা গেছে।

যেরকমটি ইচ্ছে করেছিলেন কমলাক্ষ, সেই রকমটিই জুটে গেল বোধ হয়। বরং বাড়তি কিছু ভালোই হল।

ভাড়াটে বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা নিজে নিতে হত। যত সংক্ষেপেই করো হতই কিছু ঝঞ্ঝাট। চাকর একটা খুঁজতে হত, কে জানে সে ব্যাটা সব ছিষ্টি 'চক্ষুদান' করে পালাতো কিনা, এ তবু একটা গেরস্থ বাড়ির মধ্যে।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে এসে আর সেই গা ছমছমানি ভাবটা থাকে না। ভিতরে একটা জোরালো আলো জ্বলছে, আর দালানের দৃশ্য-সজ্জায় একটি গৃহস্থ ঘরের চেহারা পরিস্ফুট হচ্ছে।

এক কোণে জলচৌকীর ওপর ঝকঝকে মাজা বাসন, টুলের ওপর গেলাস ঢাকা দেওয়া জলের কুঁজো, দেয়ালে লাগানো ব্রাকেট আলনায় কিছু জামাকাপড়।

না, শাড়ি নয় অবশ্য। ধুতি শার্ট এই সব তবু সবটা মিলিয়ে একটা লক্ষ্মীশ্রী।

'এই আপনার ঘর বাবু। এইটাই হল গে সর্বাপেক্ষা উত্তম। মানে পুব দক্ষিণ দু'দিক পাচ্ছেন।'

'সর্বাপেক্ষা উত্তম' শুনে মৃদু হেসে বলেন কমলাক্ষ, 'তা সর্বাপেক্ষা উত্তমটি আমাকে দিয়ে দিচ্ছ, তোমাদের অন্য খদ্দের এলে রাগ করবে না?'

'রাগ? রাগ মানে?' করুণাপদ উদ্দীপ্ত স্বরে বলে, 'অগ্রে যে আসবে তারই অগ্রভাগ। এই হচ্ছে জগতের আইন। তা ছাড়া সে-ভয় কিছু নেই বাবু। বললাম তো এ-সময় কেউ আসে না। যা ভিড় ওই আপনার পুজো থেকে শীতকালটি অবধি। বাকি বছর প্রায় বন্ধই পড়ে থাকে।...দাঁড়ান, আপনার হোল্ডঅল খুলে বিছানা বিছিয়ে দেই।'

থাক্ থাক্ করে উঠেছিলেন কমলাক্ষ। বলেছিলেন, অত কিছুতে দরকার নেই, বিছানা তিনি হোল্ডঅল্ খুলে নিয়ে পেতে নেবেন। এখন শুধু একটু জলের দরকার।

করুণাপদ ছাড়েনি। বলেছিল, 'জল তো দেবই, চলুন না গোসলখানায়। তা বলে বিছানা আপনি নিজেই পেতে নেবেন? বলেন কি?'

হোল্ডঅল্ খুলে পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিয়ে আলনায় তোয়ালে ঝুলিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল সে জল দিতে।

সেই অবসরে ঘরটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে নিয়েছিলেন কমলাক্ষ। ঘরটি ভালোই। বেশ শুকনো পরিষ্কার, ধুলোশূন্যই বটে। চৌকিটি মজবুত পালিশ করা, আলনাটি সভ্যভব্য, ঘরের এক কোণে ছোট্ট একখানি টেবিল, আর একখানি কাঠের চেয়ার।

তা হোক। কাঠের হোক। আস্ত মজবুত। সেই ভাড়াটে বাড়িটার ফার্নিচারের দৃশ্য স্মরণ করে আর একবার মনে মনে হাসলেন কমলাক্ষ।

যাক, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই। বন্ধ করা জানলাগুলো খুলে দিলেন কমলাক্ষ। পাশে একট জানলা থেকে কুয়োর পাড়টা দেখা যাচ্ছে। বাকি সারি সারি তিনটে জানলা পিছনের খোলা জমির দিকে। এই দিকটাই দেখছি দক্ষিণ। বাঃ! আজ অন্ধকার, কিন্তু যেদিন চাঁদ উঠবে, রাত্তির বেলা জানলা খুলে শুতে বড়ো চমৎকার লাগবে তো! অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন কমলাক্ষ। অন্যমনস্ক হয়ে সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটা অননুভূত অনুভূতিতে মনটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকারও যে দেখতে এত ভালো লাগে, তা তো কোনোদিন জানতেন না কমলাক্ষ। অন্ধকার দেখলেনই বা কবে? ভদ্রলোকেদের বেড়াতে যাবার উপযুক্ত জায়গাগুলির কোনোখানে আর অন্ধকার রেখেছে আধুনিক ব্যবস্থা?

কিন্তু অন্ধকারেরও কি একেবারেই দরকার নেই? ভাবলেন কমলাক্ষ। আছে দরকার। নিশ্চয় আছে। অবিরত চড়া আলো দেখতে দেখতে চোখের স্নায়ু শিরাগুলো যে ক্লান্ত হয়ে ওঠে, পীড়িত হয়ে ওঠে। গাঢ় ঘন কোমল এই অন্ধকার যেন কমলাক্ষর সেই ক্লান্ত হয়ে ওঠা, পীড়িত হয়ে পড়া স্নায়ু শিরাতে স্নিগ্ধ একটা ওষুধের প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে।

'বাবু জল দিয়েছি।'

চমকে উঠলেন কমলাক্ষ। ওঃ অনেকক্ষণ হয়ে গেছে দেখছি। তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কই, তোমার বাবু এসেছেন?'

'আজ্ঞে আসেননি, এই এসে যাবেন আর কি। তা তার জন্যে আপনার কিছু আটকাবে না বাবু। যা কিছু করবার মা আর আমিই করি। চলুন রাত হয়েছে খেতে বসবেন।'

কমলাক্ষ কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'কিন্তু চার্জ-টার্জ কি রকম—'

'সে এমন কিছু নয় বাবু। খাওয়া থাকা নিয়ে দিন সাড়ে চার টাকা। তা খাওয়া আপনি চারবেলাই পাবেন। সকালে চা ডিমসিদ্ধ—'

'থাক্ থাক্—' লজ্জিত কমলাক্ষ ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'সে যা হয় হবে। চার্জ তো কমই। কিন্তু এখুনি যে খেতে বসিয়ে দিতে চাইছ, পাবে কোথায়? আমার জন্যে তো আর রান্না করে রাখনি?'

করুণাপদ একগাল হেসে বলে, 'কী যে বলেন বাবু, একটা মানুষের খাওয়ার জন্যে আবার ভাবনা—! বলি বাবুর জন্যে তো আছে কিছু, তার ওপর দু'খানা ভাজা আর লুচি করে দিলেই—সে আপনি কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবু তো আর রাত এগারোটা বারোটার ইদিকে—ইয়ে চলুন বাবু চলুন, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন, বাবুর সঙ্গে দেখা আপনার গিয়ে সেই কাল সকলেই—'

করুণাপদ হঠাৎ থামতে বাধ্য হয়। দালানের ওদিক থেকে অনুচ্চ একটি স্বর আসে, 'করুণা, বাজে কথা থামিয়ে একটু এদিকে এস তো!'

কমলাক্ষর হঠাৎ মনে হল, এরা নিশ্চয়ই বেশ ভদ্রই। গলার সুরটা মার্জিত, কথার ধরনটা সভ্য।

সে-রাত্রে নয়, সে-রাত্রে কমলাক্ষ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পরদিন 'বাবু'কে দেখলেন। ব্রজেনবাবু।

রোগা পাকসিটে চেহারা, মুখচোরা মুখচোরা স্বভাব, দেখলে মনে হয় একটু পানদোষের ব্যাপার আছে বোধ হয়। অন্তত ওই রাত করে ফেরা আর চেহারার ধরনটা একত্র করে তেমনই একটা ধারণা জন্মেছিল কমলাক্ষর। কিন্তু ধারণা-টারনা ক'দিনের জন্যেই বা? সেদিনও কি কমলাক্ষ স্বপ্নেও কল্পনা করেছিলেন সাতদিনের মাথায় ব্রজেনবাবুকে নিয়ে শ্মশানে আসতে হবে তাঁকে?

সেদিন বলেছিলেন, মানে কথা বলতে হয় তাই বলেছিলেন, 'বাড়িটা কিনেছিলেন, না করিয়েছেন?'

ব্রজেনবাবু নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আস্তে উত্তর দিয়েছিলেন, 'ইয়ে, এই সামনের পোরশানটুকু কিনেছিলাম, তারপর আপনার গিয়ে আস্তে আস্তে পিছন দিকটা—মানে এখানেই যখন সেটল্ করা হল, করতে হবে তো একটা কিছু!'

একটা কিছু করতে হবে বলে হোটেল খুলতে হবে? আর কিছু করবার ছিল না? এ-প্রশ্ন তোলেননি কমলাক্ষ। ভদ্রমহিলাটিকে দেখে যেমন মনে হয়েছিল, মানে যেরকম উচ্চশ্রেণীর মনে হয়েছিল, ব্রজেনবাবুকে দেখে ঠিক তা মনে হল না।

যাক ও নিয়ে কে মাথা ঘামায়? কেনই বা মাথা ঘামাবেন?

এটা ওটা কথার শেষে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ঠিক করেছেন সকাল বিকাল বেড়াবেন, আর দুপুর সন্ধ্যা বই পড়বেন। বেশ নিরিবিলি বাড়ি, আশেপাশে অন্য বোর্ডারদের ঝামেলা জোটেনি। বেশ লাগছে, বড়ো ভালো লাগছে।

খানিক পথ এগোতেই দাঁড়াতে হল। এক ভদ্রলোক পথরোধ করেছেন।

'কী মশাই, আপনাকে যে একেবারে আনকোরা নতুন দেখাচ্ছে? কবে এসেছেন? নিশ্চয় বেশিদিন নয়। নইলে আমার চোখ এড়িয়ে—'

কমলাক্ষ সবিস্ময়ে এই আলাপী ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। ভদ্রলোকের স্বভাবটি

গায়ে-পড়া, সাজটি অদ্ভুত। সিল্কের লুঙ্গির ওপর একটা সুতির গলাবন্ধ কোট একটা চাপানো, পায়ে চপ্পল, মাথায় সোলা হ্যাট। এই সক্কালবেলাই ওনার মাথায় রোদ লাগছে নাকি?

কমলাক্ষ সবিনয়ে বললেন, 'এই কাল এসেছি।'

'কাল? কটার গাড়িতে?'

'বিকেলের।'

'বিকেলের! তা উঠেছেন কোথায়? মানে কার বাড়ির অতিথি? আমি তো মশাই এখানের পিঁপড়েটিকে পর্যন্ত চিনি—'

কমলাক্ষ হেসে বললেন, 'হিসেব মতো আমি এখানের সকলেরই অতিথি। কারণ এখানে যখন বহিরাগত। তবে ঠিক অতিথি হিসেবে কারও বাড়ি উঠিনি।'

'বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন? উইথ ফ্যামিলি তাহলে? তা তাঁরা সঙ্গে নেই যে? নেবেন, সঙ্গে নেবেন, বেড়াবার জন্যেই তো আসা। তা কার বাড়ি ভাড়া নিলেন? মানে কোন্ বাড়িটা? বাড়ির নাম বললেই বুঝব। আমার তো এখানের সবই নখদর্পণে।'

কমলাক্ষ হেসে ফেলে বলেন, 'আপনার প্রশ্নগুলির একে একে উত্তর দিতে হলে বলতে হয়, 'বাড়ি ভাড়া' নিইনি, উইথ ফ্যামিলি নয়, কাজেই তাদের সঙ্গে নেবার প্রশ্ন নেই। যে-বাড়িতে উঠেছি, তার নাম হচ্ছে 'প্রবাস আবাস—'

'প্রবাস আবাস! অ!'

ভদ্রলোক নাক কোঁচকালেন। 'তা কলকাতা থেকেই ব্যবস্থা করে এসেছিলেন বুঝি?'

কলকাতা থেকে কোনো ব্যবস্থা করে এসেছিলেন সেকথা আর বিশদ বলতে বাসনা হল না কমলাক্ষর। বোকামির কথা—কেই বা ফাঁস করতে চায়? তাছাড়া কমলাক্ষ তো কথা কমই বলেন। বেশি কথা বলা তো স্বভাবই নয়। শুধু হঠাৎ এই অতিভাষী ভদ্রলোকের আকস্মিক আক্রমণে, আর বোধ করি পরিচিতি পরিবেশের অভ্যস্ত জীবনধারার বাইরে বলেই এতগুলো কথা একসঙ্গে বললেন।

এবারও বললেন, 'ব্যবস্থার মতো ব্যবস্থা ঠিক করে আসিনি, তা এসে জুটেই গেল ঈশ্বর কৃপায়। রিকশাওলাই সন্ধান দিয়ে নিয়ে এল—'

'তা বেশ! ভালোই।' পেটের মধ্যে বেশ কিছু কথা চেপে রেখে, এবং সেটা যে চেপে রেখেছেন, তা না চেপে, ভদ্রলোক কথা শেষ করেন। 'দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন বেড়িয়ে যাবেন, এর আর কি। আজকাল তো হাড়ি ডোমও জল-চল হয়েছে। তা যাক, চলি। মশায়ের নামটি কি জানলাম না তো?'

কমলাক্ষ বিরক্ত হচ্ছিলেন। কমলাক্ষ লোকটাকে অশ্রদ্ধা করছিলেন, তবু ভদ্রতার দায়েই উত্তরটা দিতে হয়, 'কমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়।'

'মুখুজ্জে! ওঃ! একেবারে সাপের মাথার মণি! যাক 'প্রবাস হোটেলে' উঠবেন একবার এই গগন গাঙুলীর সঙ্গে যদি পরামর্শটা করতেন! আমি মশাই কখনও কারুর হিত বই অহিত চাই না। ওই যে আপনার ব্রজেন ঘোষ। যখন প্রথম এসেছিল এখানে—অভয় দিয়ে আশ্রয় দিয়ে কে এখানে শেকড় গাড়িয়েছিল ওকে? আর কেউ নয়—এই গগন গাঙুলী!'

কমলাক্ষর মনে হল, যেন কোনো নাটকের একটি 'টাইপ' চরিত্র এসে সামনে দাঁড়িয়েছে তাঁর। বাচনভঙ্গি থেকে অঙ্গভঙ্গি পর্যন্ত যেন অতি পরিচিত। এক-মিনিট দাঁড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, তবু দাঁড়াতে হয়েছিল। কারণ গগন গাঙুলী ছাড়ছিলেন না।

'আমিই পরামর্শ দিয়েছিলাম। ওই হোটেল খোলবার পরামর্শটি আমিই দিয়েছিলাম। বলি, লেখাপড়া যখন বেশিদূর নয়, আর কলকেতায় কোনো কাজকর্ম জোগাড় করতে পারওনি, তখন এখানেই সেটল্ করে ফেল। এটা ভালো ব্যবসা, স্বাধীন ব্যবসা, তা ছাড়া এই গেরস্ত পরিচালিত

হোটেলের চাহিদাও বেশি। এই অঞ্চলে নেই তো বিশেষ। অথচ স্বাস্থ্যকর জায়গা, লোকে বেড়াতে আসে। লাগিয়ে দাও, পেছনে আমি আছি।...সত্যি বলব মশাই, আমার নিজেরই ঝোঁক ছিল।...নেহাত স্ত্রীর আপত্তি। বলে—ছিঃ, শেষে লোকে আমাকে বলবে হোটেলওলি! তা স্ত্রীই যদি খাপ্পা হন মশাই, পয়সা নিয়ে কি ধুয়ে জল খাব? বলুন? তাই ওই ব্রজেন ঘোষকেই সাহায্য করে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিলাম! তারপর মশাই—যাক! সে কথা যাক। কী করা হয় মশাইয়ের?'

কমলাক্ষ মনে মনে ভাবেন, ওরে বুড়ো, তুমি ভাবছ ওই আধখানা কথা শুনিয়ে শুনিয়ে তুমি আমার কৌতূহল জাগ্রত করবে, আমিও তেমনি। কথাটি কইব না ও-সম্বন্ধে। তাই শুধু বলেন, 'এই ছেলেটেলে পড়াই।'

'পড়ান? ছেলেমেয়েদের—মানে টিউশানি? নাকি কোনো ইস্কুলে?'

'আজ্ঞে স্কুল ঠিক নয়। ইয়ে একটা কলেজে—'

'ওঃ তাই বলুন? প্রফেসর! তা বলতে হয় এতক্ষণ? আচ্ছা যান—বেড়াতে বেরিয়েছেন, আর জ্বালাতন করব না! দেখা হবেই অবিশ্যি আবার। এই পথেই তো পায়ের ধুলো দিতে হবে। একঘেয়ে মুখ দেখতে দেখতে অরুচি এসে গেছে মশাই! একটু নতুন মুখ দেখতে পেলে বর্তে যাই।'

ভদ্রলোকের ব্যাকুলতাটা অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন কমলাক্ষ। বুঝেছিলেন, এরকম একটি মফঃস্বল টাউনে দীর্ঘকাল কাটাতে হলে একঘেয়ে মুখ দেখতে দেখতে এই রকমই অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়।

বুঝেছিলেন। কিন্তু গগন গাঙুলীকে 'নতুন মুখ' দেখাবার পুণ্য অর্জন করা আর হয়ে ওঠেনি কমলাক্ষর। পরদিন অন্য পথ ধরে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তার পরদিনও। পর পর চারটে দিনই অন্ধকার থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়েছিলেন ওই সব নাম-না-জানা পাহাড়ের টিবির দিকে।

হ্যাঁ চারদিন। তারপর তো দু'টো দিন বাড়িতেই বন্দী।

কিন্তু কমলাক্ষ কেন বন্দী হলেন?

জ্বলন্ত চিতার আওতা থেকে একটু সরে গিয়ে বসে সেই কথাই ভাবছিলেন কমলাক্ষ। কমলাক্ষ এক নাম-না-জানা জায়গার শ্মশানে এসে, অজানা ব্রজেন ঘোষের শবদেহ দাহ করছেন। এই চাইতে আশ্চর্য ঘটনা কমলাক্ষর জীবনে আর কবে ঘটেছে? শ্মশানে যাওয়া সম্পর্কে আবাল্য একটা ভীতি আছে কমলাক্ষর। নিতান্ত নিরুপায় অবস্থা না হলে, ওই মৃতের বাড়ি থেকেই বিদায় কর্তব্য সারেন। আর সঙ্গে যেতে হলেও এই বীভৎস কাণ্ডটাকে চোখের সামনে দেখার যন্ত্রণাটা এড়াতে পারলে ছাড়েন না।

মাঝে মাঝে ভেবেছেন, ঈশ্বর রক্ষা করেছিলেন তাই নীরজা মারা যাবার সময় কমলাক্ষ বিলেতে ছিলেন। ফিরে এসে নীরজাকে আর দেখতে পেলেন না, এ বেদনা বড়ো বেশি বেজেছিল বটে, তবু নীরজাকে যে হাতে করে পোড়াতে হল না তাঁকে, এটার জন্যে যেন ঈশ্বরের কাছে একটা কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন। উপস্থিত থাকলে পোড়াতে তো কমলাক্ষকেই হত! তখন তো পুণ্ডরীকের মায়ের মুখে 'আগুন' দেবার বয়েস আসেনি।

আজ কমলাক্ষ ব্রজেন ঘোষের শব বয়ে নিয়ে শ্মশানে এসেছেন। যে-ব্রজেন ঘোষকে মাত্র সাতদিন আগে চোখেও দেখেননি। অথচ এ ছাড়া উপায়ও ছিল না।

কতরকম অদ্ভুত পরিস্থিতিতেই পড়তে হয় মানুষকে!

করুণাপদ কাছে এসে বলল, 'মুখজ্জে বাবু, লোকগুলো তাড়ি খাবার পয়সা চাইছে।'

তাড়ির পয়সা! এই দিন-দুপুরে তাড়ি খাবে ওরা! ভাবলেন কমলাক্ষ। কিন্তু কিছু বললেন না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা উঠল এগিয়ে ধরলেন করুণাপদর দিকে। করুণাপদ সরে গেল।

কমলাক্ষ ভাবলেন, শুধু কি ধোঁয়ার জন্যেই চোখ দিয়ে জল পড়ছে করুণাপদের? ব্রজেন ঘোষের মড়া বার করবার সময় ওর মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি কি সাজানো? করুণাপদ তো ওদের চাকর মাত্র। সামান্য একটা চাকরের মধ্যে এত ভালোবাসা থাকে?

কমলাক্ষও তো সারা জীবন চাকর রাখলেন, কত আসে কত যায়, কই তার মধ্যে এমন একটা মুখও তো মনে পড়ছে না—যে-মুখটা মনে রয়ে গেছে। চাকরবাকর সম্বন্ধে কমপ্লেন শোনা ছাড়া চাকর সম্পর্কিত আর কিছু মনে করতে পারলেন না কমলাক্ষ। এমনকি এখনই কলকাতায় তাঁর বাড়িতে যে-লোকটা রয়েছে—তার নামই অনেক ভেবে মনে আনতে হল। কী যেন? ভবেশ? হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। যে-লোকটা খুব সম্ভব বছর তিনেক আছে, আর এই তিন বছরের মধ্যে তিনটে দিনও কমলাক্ষর জুতো জোড়াটা ঝেড়েছে আর মশারিটা টাঙিয়ে দিয়েছে কিনা সন্দেহ। ঘরের খাবার জলের কুঁজোটা না ভরে ভরে মাকড়শার জালে ঢাকা পড়ে গেছে। কমলাক্ষ রাতে শোবার আগে নিজেই কাঁচের গ্লাসে করে এক গ্লাস জল রাখেন। জুতোটা রুমাল দিয়ে ঝেড়ে নেন।

কমলাক্ষ ভাবলেন, আমি যদি হঠাৎ মারা যাই, ভবেশের চোখ দিয়ে জল পড়বে? তারপর ভাবলেন, খুব সম্ভব দোষ আমার নিজেরই। আমি কারোকে লক্ষ্য করি না, আমি কারও কাছে সেবা যত্ন প্রত্যাশা করি না, আর বোধ করি আমি কাউকে ভালোবাসতেও পারিনি। জানি না ভালোবাসতে।

গণ্ডমূর্খ ব্রজেন ঘোষ হয়তো ভালোবাসতে জানত। নইলে—

করুণাপদ কুণ্ঠিত পদে আবার এল, 'আর টাকা সঙ্গে আছে বাবু? একজনের ভাগে কিছু কম পড়ছে।'

কমলাক্ষ আর একবার পকেটে হাত ঢোকালেন। 'কত কম পড়ছে?'

'আজ্ঞে তেরো আনা।'

একটা টাকা এগিয়ে ধরলেন কমলাক্ষ। ভাবলেন, এই স্বভাব মানুষের। অপ্রতিবাদে পেলেই তার ভিতরের লোভের মন জেগে ওঠে। মোটা টাকা কব্‌লেই ধরে এনেছিলেন ওদের। স্টেশনের ওদের। স্টেশনের ধারে ওই পানের দোকানটা থেকে। এটা ফাউ।

যাক। কাজটা হয়ে যাচ্ছে এই ঢের।

হয়ে যাচ্ছে। তা সত্যি। কিন্তু এর পরটা কি হবে? ভাবলেন কমলাক্ষ।

এক মাসের ছুটি নিয়ে চেঞ্জে এসেছিলেন না তিনি? তার সাতটা দিন কেটেছে। বাকি দিনগুলো নিয়ে এবার কি করবেন? কলকাতায় ফিরে যাবেন? গগন গাঙুলীর পরামর্শ নিতে যাবেন? না কি 'এক মাসের চার্জ অগ্রিম দিয়ে দিয়েছি' এই অজুহাত দেখিয়ে প্রবাস আবাসের পিছনের দিকের ওই পুব-দক্ষিণ খোলা ঘরখানা আঁকড়ে বসে থাকবেন?

রাত্রি হলেই যে-ঘরের জানলা দিয়ে মখমলের মতো মসৃণ মোলায়েম গাঢ় অন্ধকার দেখতে পাওয়া যায়, আর শেষ রাত্রি থেকে সে-অন্ধকার কাটবার যত কিছু আয়োজন সমস্তই দেখতে পাওয়া যায়, পর পর একটির পর একটি বইয়ের পাতা খোলার মতো। সূর্য ওঠার আগে যে এতরকম রঙের খেলা চলে, এটি কমলাক্ষ কোনোদিন দেখেননি?

হয়তো দেখেছেন। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই দেখেছেন। কিন্তু দেখার চোখ কি সব সময় খোলা থাকে?

* * *

বেলা পড়ে গিয়েছিল।

এখন আর আকাশে সূর্য ওঠার খেলা নয়, সূর্য ডোবার। সেটা দেখা যায় না এ-ঘর থেকে। একগ্লাস চিনির শরবত খেয়ে ঘরটায় এসে বসলেন কমলাক্ষ।

গত দু'দিন থেকে এ-ঘরে আর আসেননি মনে পড়ল। সেই পরশু দুপুরের সময় ব্রজেনের বাড়াবাড়ির সূচনা দেখা দিয়েছিল যখন—তখন থেকে।

করুণাপদর ডাকে ওদের ঘরে গিয়ে অবস্থা দেখে লজ্জায় মারা গিয়েছিলেন কমলাক্ষ। আগের রাত্তির থেকে নাকি ওইরকম ছটফট করছে ব্রজেন। বলছে, পেট বুক সব জ্বলে গেল।

বিষের জ্বালা? কিন্তু ব্রজেন ঘোষ কেন বিষ খাবে?

না না, ফুড্ পয়জনই হয়েছিল ব্রজেনের। ডাক্তারও তো তাই বলল। তা ফুড্ পয়জনের ওষুধই কি পড়েছিল ব্রজেন ঘোষের পাকস্থলীতে? ডাক্তারকে অনুরোধ উপরোধ করে ডেকে আনতে, আর স্টেশনের ধার থেকে ওষুধ আনতে, নাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল।

ছেড়ে যাওয়া নাড়ি আর কোন্ ওষুধের জোর চাঙ্গা হয়ে উঠবে?

কমলাক্ষ তাকিয়ে দেখলেন চিনির শরবতের তলানিটায় একটা মাছি পড়ল। নীল রঙা বড়ো মাপের মাছি। ব্রজেন ঘোষ বলেছিল সেদিন দুপুরে নাকি সে দোকানে বসে তরমুজের শরবত খেয়েছিল। ব্রজেন ঘোষের সেই শরবতে কি ওই রকম বড়ো মাপের একটা মাছি পড়েছিল?

চমকে দাঁড়িয়ে উঠতে হল কমলাক্ষকে।

মানে উঠলেন।

আর কেউ হলে হয়তো হোটেলওয়ালার বউকে সম্মান দেখাতে দাঁড়িয়ে উঠত না। মহিলাই ভাবত না তাকে। বলতো 'মেয়েমানুষ'। কমলাক্ষ তা বলেননি। কিন্তু কমলাক্ষই কি ভেবেচিন্তে সম্মান দেখাতে দাঁড়িয়েছিলেন? তা নয়। দাঁড়িয়েছিলেন আকস্মিক চমকে উঠে। বিনা ভূমিকায় কথাটা বলে বসেছিল কিনা লীলা।

'ওখানে তো শুনলাম পয়সা পয়সা করে আপনাকে খুব জ্বালাতন করেছে—'

কমলাক্ষ বোধ করি এসময় ঠিক এ-ধরনের কথার জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তাই থতমত খেয়ে বলেন, 'না না, জ্বালাতন কি? জ্বালাতন কিছু না। মানে জ্বালাতন তো ওরা করবেই—'

'তা বটে।' লীলা তার স্বভাবগত ভঙ্গিতে সেই একটু হাসির মতো সুরে বলে, জ্বালাতন করাই তো ওদের পেশা। কিন্তু আপনার কাছে আমার পেশাটাও প্রায় তাই দাঁড়াচ্ছে। ঋণশোধ কথাটা উচ্চারণ করবার ধৃষ্টতা নেই। কিন্তু একটু ধৃষ্টতা তো করতেই হচ্ছে। আগে, পরে, মাঝখানে, অনেক খরচপত্রই তো হয়ে গেল আপনার—'

টেবিলের ওপর একগোছা দশটাকার নোট নামিয়ে রাখল লীলা। আর রাখার পর ঈষৎ হেসে বলে, 'আমি কিন্তু হিসেব করে মিটিয়ে দিতে পারব না। কম হলে কমই হল।'

কমলাক্ষ একবার মুখ তুলে তাকালেন। মুখ দেখা গেল না। ভাবলেন লীলা যেন বড়ো বেশি প্র্যাকটিক্যাল। আজই তাড়াতাড়ি টাকাকড়ি—

যদিও আজ সকাল পর্যন্ত নামটা জানতেন না কমলাক্ষ, শুধু শবদাহের সার্টিফিকেটের সূত্রে জেনেছেন, তবু ইতিমধ্যে ওকে 'লীলা' ভাবতেই অভ্যাস হয়ে গেছে। তারপর ভাবলেন, এটাই স্বাভাবিক, আমি আর কে ওর? নিতান্ত পর বই নয়। পাকে চক্রে ওর বিপদের সময় একটু উপকারে লেগে গেছি বলেই কিছু আর আপনার লোক হয়ে যাইনি। ঋণ রাখতে চাইবে কেন?

তবু বললেন, 'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনি এখুনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

'ব্যস্ত কিছু না। রয়েছে হাতে—'

'তা হোক। এখন থাক।'

আশঙ্কা করছিলেন হয়তো অনেক অনুরোধ আসবে, এবং শেষ পর্যন্ত নিতেই হবে। কিন্তু তা হল না। লীলা আস্তে নোটগুলো তুলে নিয়ে বলল, 'তবে থাক।'

'রাগ করলেন নাকি?'

'রাগ? তা হবে। যদি সেটাই সম্ভব বলে মনে হয় আপনার।'

'না না, মানে—'

'থাক। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু শুনুন, আজ আর আপনি বাড়িতে খেতে পাবেন না। করুণাপদ চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। অথচ পরশু থেকে বাজার দোকান—'

'কী আশ্চর্য! আপনি কি আমাকে একটা জানোয়ার ঠাওরেছেন? তাই আজ আমার খাবার ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছেন?'

'কাল রাত থেকে তো খাওয়া হয়নি—'

কমলাক্ষ খপ্ করে বলে ওঠেন, 'সে তো আপনারও হয়নি।'

'আমার? তা হয়নি বটে।' বলে টাকাটা আঁচলে বাঁধতে লাগল লীলা।

একটু বেশিক্ষণ কি সময় লাগল তার? গিঁটটা কি বার বার আলগা হয়ে যাচ্ছিল? তা বাঁধার পরও দাঁড়িয়েই থাকল কেন?

কমলাক্ষ একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'আপনি তো একটু শরবতও খেতে পারতেন!'

'তা পারতাম।'

'কি আর বলব।' কমলাক্ষ একটা নিশ্বাস ফেলেন, 'এমন অবস্থা আপনার, কেউ যে একটু জল এগিয়ে দেবে—'

কথাটা শেষ করা নিরর্থক বলেই হয়তো করলেন না কমলাক্ষ। লীলাও এই অসম্পূর্ণ কথার কোনো উত্তর দিল না। আস্তে বলল, 'যাই।'

ও চলে গেলে কমলাক্ষর মনে হল কথাবার্তায় তিনি বড়ো অপটু। এরকম সদ্য শোকাহত মানুষকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে কথা বলা বোধ হয় উচিত ছিল। কিন্তু কী-ই বা বলবেন? বাজার চলতি সেই ছেঁদো কথাগুলো? 'কী আর করবে! এই তো জগৎ'—ইত্যাদি! ছিঃ!

ভাবলেন ব্রজেন ঘোষের বউ যদি ব্রজেন ঘোষের মতোই হত, হয়তো চেষ্টা করে ওরকম দু'একটা কথা বলতে পারতেন। অন্তত চেষ্টাও করতেন। আর ওই টাকাটা রাখতে এলে বলতে পারতেন, 'সে কি! বিপদের সময় মানুষ মানুষের করবে না? ও-টাকা আপনি রাখুন, শোধ দিতে হবে না।'

কিন্তু ব্রজেন ঘোষের স্ত্রী ব্রজেন ঘোষের মতো নয়। কোথায় যেন আকাশ পাতাল তফাত। আশ্চর্য রকমের অন্যরকম। তাই কমলাক্ষ নিতান্ত অপটুর মতো বসে রইলেন। এটুকুও বলতে পারলেন না, করুণাপদ না উঠুক, আমিই যাচ্ছি। বাজার থেকে একটু মিষ্টি এনে দিচ্ছি, জল খান আপনি। বাঁচতে তো হবে।

অথচ ঠিক ওই কথাগুলোই বলতে ইচ্ছে করছিল। ওই রকমই কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছিল। কোনো মেয়ের খাওয়া হয়েছে কি হয়নি এ-খোঁজ কমলাক্ষ জীবনে কখনও করেছেন?

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাঠের দিকের সেই জানলাগুলো খুলে দিলেন কমলাক্ষ। খুব খানিকটা বাতাস এসে পড়ল একসঙ্গে। কমলাক্ষ দাঁড়িয়ে থাকলেন জানলার কাছে।

আর একবার ভাবলেন, কি উচিত তাঁর এখন? থাকবেন, না চলে যাবেন? হোটেলের মালিক মারা যাবার পর, কেবলমাত্র অগ্রিম চার্জ দেওয়ার ছুতোয় মালিকের স্ত্রীর ওপর জুলুম চালিয়ে খাওয়াদাওয়া চালিয়ে যাওয়া সঙ্গত?

অথচ এটাও ভেবে পেলেন না, আত্মীয়স্বজন বলতে যার আর কেউ কোথাও নেই, পাড়ার লোকে যার মুখ দেখে না, তাকে একলা অসহায় এই মাঠের মাঝখানের একটা বাড়িতে ফেলে চলে যাওয়া যায় কি করে?

কমলাক্ষকে এ-দায়িত্ব কে দিল কে জানে! তবু কমলাক্ষ না ভেবে পারছেন না। ব্রজেন ঘোষের এই হোটেল এরপর আর কি চলবে? লীলা কি একা হোটেল চালাতে পারবে? কত রকমের লোক আসতে পারে, কত অসৎ লোক। আর চারিদিকেই তো শত্রু ওর।

নাঃ, অসম্ভব!

তা শুধু চারিদিকেই নয়, ওপর দিকেও শত্রু লীলার। নইলে করুণাপদ অমন ঘাড় ভেঙে জ্বরে পড়বে কেন?

'দেখছি আপনাকেই আজ হাটে যেতে হবে—' চায়ের পেয়ালাটি সামনে নামিয়ে রেখে কথাটি শেষ করল লীলা, 'করুণাপদ তো দিব্যি জ্বর বাধিয়ে বসল। অথচ আজ হাট—'

কমলাক্ষ চিরদিনই অন্যমনস্ক প্রকৃতির। কোনোদিনই সমাজব্যবস্থা আচার-নিয়ম সম্পর্কে মাথা ঘামাননি। তবু কমলাক্ষর চোখে পড়ল, মানে চোখে না পড়ে পারল না, নতুন বৈধব্যের বেশ ধারণ করেনি লীলা। আগেও যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে দেখে বিস্ময় বোধ করলেন কমলাক্ষ। আবার কৃতজ্ঞও হলেন। সেই একটা কি যেন ভয়ঙ্কর ব্যাপার আছে! ভাবলেই হৃৎকম্প হয়।

আস্তে বললেন, 'হাটের দরকার বোধ হয় শুধু আমারই জন্যে? করুণাপদর তো জ্বর হয়েছে। আর আপনারও—'

'না, আমার আর জ্বর হল কই? আমি তো দিব্যি—ভালোই আছি!' জানলার বাইরে তাকিয়ে কথা বলছে লীলা। কমলাক্ষর মনে হল, ও যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে।

একটু থেমে কুণ্ঠিতকণ্ঠে বললেন, 'না তা ভাবছি না। মানে আপনি তো আর ভাত-টাত—মানে ফল-টল ছাড়া আর কিছু তো—'

লীলা হাসল। হাসির মতো নয়, সত্যিকার হাসি। হেসে বলল, 'আপনার মতো লোকের হেফাজতে যে-মেয়ে থাকতে পারে তার আর জীবনে কোনো দুঃখ থাকে না। আপনার স্ত্রীকে এত ভাগ্যবতী মনে হচ্ছে যে—'

কমলাক্ষও হাসলেন। বললেন, 'যাই মনে হোক, এই মর্ত্যলোকের কোনো কিছুই আর তাঁর কাছ পর্যন্ত পৌঁছবে না?'

লীলার মুখের হাসিটা মিলাল। 'নেই বুঝি?'

'নাঃ, বহুকাল আগেই—'

'তাই হবে। সেটাই স্বাভাবিক—'। কমলাক্ষর মনে হয়, এখনও যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে লীলা, 'বাংলাদেশের মেয়ে তো! এত বেশি সৌভাগ্যের ভার কতদিন আর বইবে? তারপর সহসাই যেন সচকিত হয়ে বলে ওঠে, 'না, ফল-টল কিছু লাগবে না। আপনিও যা খাবেন, আমিও তাই খাব। অবাক হচ্ছেন? হওয়াই সম্ভব। কিন্তু কি জানি কেন হঠাৎ বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে সত্যি কথাটা বলি—'

'সত্যি কথা!' যন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেন কমলাক্ষ।

লীলা মুখ তুলে শান্ত গলায় বলে, 'হ্যাঁ, সত্যি কথা। যে-কথা আজ পর্যন্ত কাউকেই বলা হয়ে ওঠেনি। বলা যায়নি। সেই কথাটাই বলছি আপনাকে। উনি আমার স্বামী ছিলেন না।'

মাথার ওপর হঠাৎ এসে লাগা একটা হাতুড়ির আঘাতের অনুভূতি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন কমলাক্ষ। সেই অসাড় অনুভূতি নিয়েই অনেকটা পথ চলেছিলেন। হঠাৎ আবার সেদিনের মতো পথরোধ হল।

আবার গগন গাঙুলী। চলেছেন হাটের পথে।

'কী মশাই, রয়েছেন এখনও? তা হলে দেখছি—পাড়ার পাঁচজনের কথাই সত্যিই। আমি তো বিশ্বাস করতেই চাইছিলাম না। বলছিলাম, না না, ভদ্রলোকে আর একটি দিনের জন্যে দেখলাম না, নিশ্চয় চলে গেছেন। তা আছেন কোথায়?'

কমলাক্ষর ইচ্ছে হল লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে যান। কিন্তু এ-ধরনের সাধু ইচ্ছের পূরণ আর কবে কার হয়? তাই উত্তর দিতে হল। 'যেখানে ছিলাম, সেখানেই আছি।'

'অ! তা হলে ওদের সব কথাই বর্ণে বর্ণে সত্য। তা এত কাণ্ডের পরও ওখানেই রয়ে গেলেন তা হলে?'

কমলাক্ষর ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল। রুক্ষ হয়ে উঠলেন তিনি।

'কাণ্ড-টাণ্ডগুলোর খবর তা হলে পেয়েছেন আপনারা? আমি ভেবেছিলাম পাননি।'

'কেন, ছুটে গিয়ে ব্রজেন ঘোষের মড়ায় কাঁধ দিইনি বলেই? দু'দিন বেড়াতে এসেছেন, এখনও চোখে কলকাতার ঘোর লেগে রয়েছে, তাই মেজাজ এত শরীফ্। বলি মশাই—যে লক্ষ্মীছাড়া লোক চাকর হয়ে মনিবের ঘরের মেয়েকে বার করে এনে স্বামী-স্ত্রী সেজে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে, হাতে ভাত খাইয়ে জাত নষ্ট করে, আর মদের পয়সা জোটেনি বলে 'ইস্পিরিট' খেয়ে মরে কেলেঙ্কার করে, তার মড়ায় কে কাঁধ দেবে? দিইনি বলে মোটেই নিজেকে মস্ত একটা অপরাধী মনে করছি না।'

কমলাক্ষ ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। তাকিয়ে রইলেন গগন গাঙুলীর মুখের দিকে। কমলাক্ষর জন্যে আর কতগুলো হাতুড়ির ঘা আছে?

ওই হাঁ করা মুখের দিকে তাকিয়ে গগন গাঙুলী বড়ো আমোদ পাচ্ছেন। মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

'রইলেন এতদিন, অথচ এলেন না তো মশাই একদিন! তা হলে ভেতরের সব ঘটনাটাই শোনাতে পারতাম।'

'শোনবার জন্যে খুব বেশি উদগ্রীব নই আমি।' বলে জোর পায়ে এগিয়ে যান কমলাক্ষ, গগন গাঙুলীকে প্রায় ঠেলেই।

অদ্ভুত লাগছে! ভারী অদ্ভুত লাগছে!

চারিদিক থেকে যেন জটিলতার জাল এসে ঘিরে ধরেছে। একটা সুটকেস ভর্তি বই এনেছিলেন না কমলাক্ষ! শুধু পৃথিবীর একটুকু নিভৃত কোণ আর খানকতক বই এই সম্বল করে ছুটির একটা মাস কাটিয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন না?

সে দিন আর পাওয়া গেল না।

কিন্তু হিসেব করে দেখলে চার-পাঁচটা দিন তো একেবারে মনের মতো অবস্থাই পেয়েছিলেন কমলাক্ষ! কই, বইয়ের সুটকেস খুলেছিলেন কই! হাতও তো দেননি একখানা বইয়ে। কী করেছিলেন তবে সন্ধ্যা আর দুপুর?

কী করেছিলেন মনে করতে পারলেন না। মনে পড়ল ঘরের পিছনে মাঠের দিকে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছেন মাঝে মাঝে। হয়তো অনেকক্ষণ ধরে।

তবু কতক্ষণ? কি ভেবেছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

কলকাতার কথা? কলেজের সমস্যা? খাতা দেখা ফাঁকি দেওয়া? কই? পলাশপুর আসার আগের কমলাক্ষকে কি মনে ছিল পলাশপুরে আসা কমলাক্ষর? এ তো বড়ো সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড! মাঝে মাঝে তো কত জায়গাতেই যান, কই এমন আত্মবিস্মৃত ভাব তো আসে না।

কমলাক্ষ কি পূর্বজন্ম মানবেন? মেনে ভাববেন পূর্বজন্মে তিনি এই পলাশপুরে ছিলেন? তাই জন্মান্তরের পথ বেয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ভুলে যাওয়া স্মৃতির রেশ? সেই রেশ উন্মনা করছে কমলাক্ষকে, ব্যাকুল করছে?

হঠাৎ মনে হল শুধু পূর্বজন্মের স্মৃতিই নয়, পূর্বজন্মের শত্রুও কেউ ছিল। সে কমলাক্ষকে নিয়ে মজা দেখতে চায়। নইলে কত লোক এসেছে ব্রজেন ঘোষের 'প্রবাস আবাসে,' ঠিক কমলাক্ষর উপস্থিতির অবসরেই মদের অভাবে স্পিরিট খেয়ে মরে কেলেঙ্কারি করবার বাসনা হল ব্রজেন ঘোষের?

তা গগন গাঙুলীর কথাই কি নির্ভেজাল? এই বিদঘুটে কথাটা সত্যি?

'সত্যি নয়',—একথাও জোর করে ভাবতে পারলেন না কমলাক্ষ। এটা টের পেয়েছেন গগন গাঙুলী, এই পলাশপুরের গেজেটের খবর উনি যেমন সরবরাহ করেন, তেমনি খবর আসেও ওঁর কাছে। মনে পড়ল ব্রজেনের সেই ছটফটানি, 'বুক পেট জ্বলে গেল।'

ডাক্তার বলল ফুড পয়জন। বলে দিল যা হয় একটা কিছু। বুঝতে পারছি না বলতে হলে তো মান থাকে না। বিশেষ করে মফঃস্বলের হাতুড়েদের। আর সত্যি সে বেচারা ধারণাই বা করবে কি করে লোকটা স্পিরিট খেয়ে মরতে বসেছে।

আচ্ছা সত্যিই খেয়েছে? মদের পয়সার অভাব হল কেন? লীলার কাছে তো অনেকগুলো টাকা ছিল। লীলা দেয়নি? টাকা কার? লীলা মনিবের মেয়ে, ব্রজেন ঘোষ চাকর। চাকরের সঙ্গে চলে এসেছে লীলা? তাই তাদের আত্মীয় নেই বন্ধু নেই? তাই প্রতিবেশীরা তাদের দেখে না?

কিন্তু এতদিন ধরে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে চালিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ কমলাক্ষকে দেখেই বা সে-ধুলো উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করল কেন লীলার? ব্রজেন ঘোষ মারা গেল বলে?

রাস্তায় কেন বেরিয়েছিলেন মনে পড়ল না কমলাক্ষর। হঠাৎ যখন খেয়াল হল রোদটা বড়ো চড়া হয়ে উঠেছে, তখন ফিরতি মুখ ধরলেন। আর বাড়ির কাছাকাছি আসতে আসতে একটা আশ্চর্য সত্য আবিষ্কার করলেন।

এত কথা শোনার পর, আর সে-সব কথা প্রায় বিশ্বাস করে নেওয়ারও পরে লীলাকে লীলাই মনে হচ্ছে। ভয়ানক একটা ঘৃণ্য অপবিত্র কদর্য জীব বলে মনে হচ্ছে না।

'তাহলে ফিরে এলেন? আমি ভাবছিলাম রাগে-ঘেন্নায় বোধ হয় চলেই গেলেন। করুণাপদ পড়ে, ভেবে পাচ্ছিলাম না কাকে দিয়ে আপনার জিনিসগুলো স্টেশনে পাঠিয়ে দেব। ট্রেনের সময় অবধি থাকতেনই তো স্টেশনে।'

কমলাক্ষর এতক্ষণে মনে পড়ল তাঁর হাটে যাওয়ার কথা ছিল। মনে পড়ল করুণাপদর জন্যে একটু ওষুধ আনবেন ভেবেছিলেন। কিচ্ছু করেননি। শুধু হাতে ফিরেছেন।

লজ্জায় মাথাকাটা গেল। তবু লীলার ওই একঝাঁক কথার একটা উত্তর না দিয়ে পারলেন না। বললেন, 'এতগুলো কথা ভাবতে পারলেন, আর চলে যাওয়াটা সম্ভব কি না সেটা ভাবতে মনে পড়ল না?'

লীলার মুখটা কী ক্লান্ত বিবর্ণ শুকনো দেখাচ্ছে! প্রথম যেদিন এসে দেখেছিলেন, তার থেকে কত বদলে গেল। সাজ বদল করেনি, তবুও কী বদলানোই বদলেছে!

তা হোক, শুকনো বিবর্ণ ক্লান্ত যাই হোক, হাসিটা ঠিক আছে। আর বোধ করি হেসে ভিন্ন কথা কইতেই পারে না লীলা। কে জানে, গগন গাঙুলীদের সাথে কথা বলতে হলেও লীলা এমনি হাসি মিশিয়ে কথা কয় কি না।

লীলা হাসল। 'সেটা মনে পড়ানো উচিত ছিল বুঝি?'

'ছিল।'

'তবে আমারই অন্যায়। কিন্তু মানুষের হিসেব মতো আপনার তো চলে যাবারই কথা।'

কমলাক্ষ বললেন, 'মানুষের হিসেবে যখন মিলছে না, তখন বোধ করি অমানুষ। নইলে আর হাটে যাব বলে বেড়িয়ে এসে শুধু হতে বাড়ি ফিরি?'

'হাটে যাবেন বলেই বেরিয়েছিলেন বুঝি?'

'এখন তো তাই মনে হচ্ছে।'

'তখন হচ্ছিল না?'

'কি জানি।'

সহসা একটু গম্ভীর হয়ে যায় লীলা। গম্ভীর হয়ে বলে, 'কিন্তু কেনই বা আমাকে ঘেন্না করবেন না আপনি?'

'তাই তো আমিও ভাবছি সেই থেকে।'

কমলাক্ষ তাকালেন বিচিত্র একটা দৃষ্টিতে। যে-দৃষ্টির খবর তিনি নিজেও জানেন না।

'আমার সব কথা শুনলে, এ-ভাবনা বজায় রাখা শক্ত হবে। ঘেন্না না করে পারবেন না।'

কমলাক্ষ মৃদু হাসলেন। 'সবই শুনেছি।'

'সব? বলুন তো শুনি কতটা কি শুনেছেন।'

কমলাক্ষ আর একটু হাসলেন। বললেন, 'বেশি বলার দরকার কি? গগন গাঙুলীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এইটুকু বললেই বুঝে নিতে পারবেন না?'

লীলা কিন্তু আর হাসে না। লীলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। আর সেই গম্ভীর হয়ে যাওয়া লীলাকে দেখে মনে হয় এই বুঝি আসল লীলা। ওই হাসি মেশানে কথা কওয়া লীলা, সাজানো লীলা। ওটা লীলার ছদ্মবেশ। অত গভীরতায় তলিয়ে থাকলে, কেউ ওর নাগাল পাবে না বলে দয়া করে ওই হালকা হাওয়ার চাদরটা জড়িয়ে বসে আছে।

এখন লীলা সেই ছদ্মবেশ ত্যাগ করেছে। নিজের আসল সুর আর স্বর নিয়ে বলছে, 'গগন গাঙুলীই কি সব জানে?'

কমলাক্ষ উত্তর দিলেন না। এই গভীরতাকে হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখবার ইচ্ছে হল না তাঁর। চুপ করে থাকলেন।

লীলাই ফের কথা বলল। 'জানে না। জানে কি, বামুনের মেয়ে হয়ে শূদ্রের ছেলের সঙ্গে, মনিবের মেয়ে হয়ে চাকরের সঙ্গে, পালিয়ে আসা ছাড়াও, আরও ভয়ঙ্কর অপবিত্রতা আছে আমার মধ্যে? জানে কি, বিখ্যাত সেই আপনাদের 'দাঙ্গা'র হাজার বলির মধ্যে আমিও একটা বলির পশু?'

কমলাক্ষ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। অস্ফুটে একবার যে উচ্চারণ করেছিলেন 'চাকর?' আর তার উত্তর পাননি, সে-কথা ভুলেই গেলেন।

কিন্তু লীলা বুঝি ভোলেনি। তাই লীলা বলে ওঠে, 'লোকে বলে চাকর। পরিচয়টা তাই ছিল। বাবার প্রেস ছিল, আর ও ছিল সামান্য কম্পোজিটার। প্রুফ কারেক্টার নিমাইবাবু নাকি বলতেন, ছাপাখানার সব ভূত কি তোর মাথাতেই এসে অধিষ্ঠান করে ব্রজেন?...তা হয়তো তাই।' খুব আস্তে আস্তে ফেলা একটা নিশ্বাস যেন চুপি চুপি বাতাসের সঙ্গে মিশে যেতে চাইল। যেন ওকে দেখতে পাওয়া গেলে লজ্জায় নীল হয়ে যাবে ও।

'ভূতই অধিষ্ঠান করেছিল ওর মাথায়। নইলে মেয়ে লুঠ হয়ে যাবার পর মা-বাপ পর্যন্ত যখন 'মনে করব মরে গেছে' বলে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, মাইনে করা চাকর ব্রজেন ঘোষের কি দরকার পড়েছিল জীবন মরণ তুচ্ছ করে তাকে খুঁজে বেড়ানোর? কী দরকার পড়েছিল বাঘের গুহা থেকে উদ্ধার করে এনে আজীবন তাকে মাথায় বয়ে বেড়ানোর?'

কমলাক্ষ এবার কথা বললেন 'বাড়িতে বুঝি আর গ্রহণ করলেন না?'

'পাগল হয়েছেন? তাই কখনও করে? তাদের আরও সব রয়েছে না? একটা মেয়ের জন্যে সব খোয়াবে নাকি? থাক, ও তো একেবারে পচা গলা কথা। হাজার হাজার জনের একজন আবার নতুন কথা কি শোনাবে? নতুন শুধু ওই রোগা হ্যাংলা মুখচোরা কম্পোজিটারটার পাগলামীর গল্প। তার আগে লোকটা মনিবের মেয়ের সঙ্গে গুনে দশটা কথাও বলেছে কি না সন্দেহ! অথচ—সাধে কি আর বলছি ভূতাশ্রিত! নইলে ওইটুকুকে সম্বল করে দুর্জয় সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে? আর সারাজীবন একটা অশুচি অপবিত্র বোঝা মাথায় নিয়ে—'

কমলাক্ষ স্থির স্বরে বললেন, 'এ পর্যন্ত সবই বুঝতে পারলাম। বুঝতে অসুবিধে হল না। শুধু

একটা কথা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে—সংসার যখন আপনাকে ত্যাগ করেছিল, বিয়েটার বাধা ছিল কোথায়?'

লীলা মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বলে, 'সে কথা এই খানিক আগেই ভাবছিলাম। বাধা ছিল হয়তো ওর নিজের মধ্যেই। নিজেকে বোধ করি মনে মনে কিছুতেই আর মনিবের মেয়ের পর্যায়ে তুলতে পারল না। তাই সমস্ত সাজানো পরিচয়, ড্রইং রুমের সাজের মতো বাইরেই পড়ে থাকল। ও শুধু সৃষ্টিছাড়া এক অস্বস্তি নিয়ে সারা জীবন পালিয়ে বেড়াল।'

কেন কে জনে কমলাক্ষ সহসা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। আরক্ত মুখে বলেন, 'বাধা শুধু তাঁর মধ্যেই ছিল না, ছিল আপনার মধ্যেও। নইলে সেই, 'সৃষ্টিছাড়া অস্বস্তির বাধা' ধূলিসাৎ হতে দেরি হত না। আপনিও কোনোদিন তাঁকে মানুষ ভাবেননি। তাই—'

'তা সত্যি—' কথার মাঝখানেই উত্তর দেয় লীলা। আস্তে শান্ত গলায় বলে, 'সত্যিই মানুষ ভাবিনি! রক্তমাংসের মানুষ! পাথরের দেবতাই ভেবে এসেছি বরাবর।'

জরাজীর্ণ দেহটা নিয়ে করুণাপদ যেদিন 'পোরে'র ভাত দিয়ে পথ্যি করতে বসল, সেদিন কমলাক্ষর ছুটির শেষ দিন।

ক্যালেন্ডারের পাতার দিকে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবছিলেন কমলাক্ষ। আজ ফিরবার কথা ছিল। কলকাতা বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে তাঁর একটা কর্মজগৎ আছে, এসব যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। আর প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের সেই ছোটো দোতলা বাড়িখানা? সেটাই কি স্পষ্ট আছে?

সে-বাড়িতে কি কখনও কারও অসুখ করেনি? কই কমলাক্ষর তো মনে পড়ছে না, তিনি কোনোদিন নিজের হাতে বরফ ভেঙেছেন, ফলের রস করেছেন, পাখা হাতে রাত জেগেছেন। ব্রজেন ঘোষের চাকর করুণাপদর জন্যে এসব করেছেন কমলাক্ষ। ব্রজেন ঘোষের কাছে কত ধার ছিল কমলাক্ষর?

তবে আশ্চর্য, খুব খারাপও কিছু লাগেনি। বরং কেমন একটা দৃঢ়তা আর উৎসাহের ভাবই মনে এসেছে। যে-রাত্রে তাঁর জাগার জন্যে লীলার একটু ঘুমোতে পেয়েছে, সে রাত্রিটা তো মধুর একটা গানের মতো লেগেছে।

আর যে-রাত্রে রুগী বিকারের ঝোঁকে তেড়ে তেড়ে ওঠার জন্যে দু'জনকেই জেগে বসে থাকতে হয়েছে?

ও রকম ভীতিকর পরিস্থিতিটাও অমন ভালো লাগত কি করে ভেবে পাচ্ছেন না কমলাক্ষ। 'প্রবাস আবাসে'র এই বাড়িটার মোহময় জাদু? যে-জাদুর ছোঁয়ায় প্রথম দিনই কমলাক্ষ যেন আর এক জগতের খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন?

কিন্তু বড়ো বেশি ভালোলাগা সেই দক্ষিণের জানলাগুলো তো কতদিনই খোলা হয়নি। সে-ঘরে থাকাই হয়নি কতদিন।

করুণাপদর জ্বরটা যেদিন চড়ে উঠে বিকারে দাঁড়াল, সেদিন কমলাক্ষ হাসপাতালের কথা তুলেছিলেন। লীলা বলেছিল, 'হাসপাতালে দেওয়া যাবে না। হাসপাতালে ওর বড়ো ভয়। একবার পক্স হয়েছিল, হাসপাতালের নাম শুনে হাউ হাউ করে কেঁদেছিল। ওর ধারণা যে ওখানে গেলেই মরে যাবে।'

কমলাক্ষ বলেছিলেন, 'ওদের ক্লাসের সকলেরই প্রায় ওই ধারণা। কিন্তু এখন তো ও টেরও পাবে না কোথায় আছি। দিলে ফল ভালো হত।'

লীলা হেসেছিল, 'ফল ভালো হবেই এমন গ্যারান্টি কে দিচ্ছে? খারাপও হতে পারে। তেমন হলে নিজেকে আমি কি জবাব দেব বলুন? মা বাপ ছেড়ে এসেছে, আমায় 'মা' বলে ডাকে—'

কি একটা কাজের ছুতোয় তাড়াতাড়ি উঠে গিয়েছিল লীলা। আর কমলাক্ষ স্টেশনে ছুটেছিলেন

বরফ আনতে। তারপর কে জানে কোথা দিয়ে কেটে গেছে এতগুলো দিনের দিনরাত। দিনগুলি যে এতগুলো, আজ ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে অনুভব হচ্ছে।

পুণ্ডরীকের চিঠিখানা খুললেন কমলাক্ষ। সকালের ডাকে যেটা এসেছে ও জানিয়েছে, আজই যখন কমলাক্ষর ফেরার দিন, তখন আর বাড়তি ব্যস্ত করবার দরকার বিবেচনা করেনি সে, তবে জানিয়ে যাবার জন্যে জানাচ্ছে, কয়েকদিনের জন্যে দার্জিলিং যাচ্ছে সে আজ। আর যাবার আগে তার দিদিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনিয়ে বাড়িতে রেখে যাচ্ছে। খুব স্বাভাবিক আর সাধারণ চিঠি। শুধু শেষের একটা লাইন ঘুরে ফিরে চোখের সামনে এসে যেন তর্জনি তুলে দাঁড়াচ্ছে—।

লাইনটা 'পুনশ্চ'র—

'হ্যাঁ ভালো কথা—আপনার পলাশপুর থেকে একটা অদ্ভুত চিঠি এসেছে, অর্থ হৃদয়ঙ্গম হল না। লেখকের নামও নেই।'

কী সেই অদ্ভুত চিঠি? যার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না?

কমলাক্ষ কি ছেলের এই চিঠির কথা লীলাকে বলবেন? বলবেন, 'দেখুন তো আপনাদের এখান থেকে আমরা ছেলের কাছে বেনামী চিঠি লেখবার দরকার কার পড়ল? কে আছে তেমন লোক?'

অবশ্য 'কে আছে' সেটা বোঝা শক্ত নয়। কমলাক্ষ সনাক্ত করেছেন তাকে। গগন গাঙুলী ছাড়া আর কে?

অপরের কথা ভিন্ন যারা থাকতে পারে না, অপরের একটু অনিষ্ট করতে পেলে যারা মনে করে জগতে এসে তবু একটা 'পরম' কিছু করা হল—গগন গাঙুলী সেই জাতের লোক।

কিন্তু কী লিখেছে সে? যার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না?

পুণ্ডরীক লিখেছে, 'দিদিকে এনে রেখে যাচ্ছি। আর আপনি তো কালই এসে পড়ছেন।' কমলাক্ষর খেয়াল হল পলাশপুরে এসে পর্যন্ত মেয়েকে তিনি একটাও চিটি দেননি। খুব বেশি চিঠি দেওয়ার অভ্যাস তাঁর না থাকলেও, এক আধটা দেওয়া উচিত ছিল। দেননি। দেবার কথা মনেও পড়েনি। কমলাক্ষ ভাবলেন, আজ আমার যাবার কথা ছিল।

ভাবলেন, আজ আমি যাব কি করে?

'আমার কথা ভাবছেন আপনি?' লীলা সত্যি অবাক হয়ে গেছে। 'আমার কি হবে, সে-কথা আপনি ভাবতে বসবেন।'

কমলাক্ষর ইচ্ছে হল খুব ভালো একটা উত্তর দেন, কিন্তু মুখে জোগাল না কিছু। তাই বললেন, 'তা একজন কাউকে তো ভাবতে হবে?'

'কেন? হবে কেন? ভগবানও যার জন্যে ভাবছেন না, এমন লোকেরই কি অভাব আছে সংসারে?'

'বিশ্ব সংসারে সবাইয়ের ভাবনা ভাববার গরজ আমার সেই।'

'কিন্তু আমার ভাবনা ভাববার গরজই বা কেন হচ্ছে আপনার, সেও তো এক রহস্য।'

কমলাক্ষ উত্তেজিত হলেন। বললেন, 'সেটা একটা রহস্য হল আপনার কাছে? ব্রজেনবাবু মদের বদলে স্পিরিট খেয়ে মরবেন, করুণাপদ দেশে যাবে বলে গোঁ ধরবে, আর—'

হঠাৎ থেমে গেলেন। রাগের মাথায় ব্রজেনবাবুর মৃত্যু রহস্যটা এইভাবে উদ্‌ঘাটিত করে ফেলে মরমে মরে গেলেন। চাবুক মারতে ইচ্ছে হল নিজেকে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিলে তিনি।

গণ্ডমুখ্যু ব্রজেন ঘোষ যে লীলার কাছে কি, তা তো তাঁর অবিদিত নেই। তার মৃত্যুর এই শোচনীয় কারণটা জানিয়ে লীলাকে নতুন করে আবার শোকের মধ্যে ফেললেন তিনি। রাগলে এত গোঁয়ার হয়ে ওঠেন তিনি, তা তো জানা ছিল না!

কিন্তু কই, চমকে উঠল না তো লীলা! শুনে 'কাঠ' হয়ে গেল না তো? সেই ওর নিজস্ব ভঙ্গিতে একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলল, 'স্পিরিট খাওয়ার কথাটা জানা হয়ে গেছে আপনার?'

কমলাক্ষই চমকে গিয়ে চুপ করে থাকেন।

লীলা আবার বলে, 'এ অভ্যাস ওর নতুন নয়। আমি টাকা বন্ধ করলেই ওই কাণ্ড করত। সেদিন বেশি খেয়ে ফেলেই—দোষ আমারই। দেবতা হবারও যে একটা মাশুল লাগে, সেটা কিছুতেই খেয়ালই করতাম না আমি। পুরোপুরি পাথরের দেবতাই দেখতে চাইতাম। তাছাড়া—' হাসল লীলা, 'টাকাও তো—'

কমলাক্ষ ব্রজেন ঘোষকে ভালোবেসেছিল। তাই কমলাক্ষর কণ্ঠে ক্ষুব্ধ স্বর ফোটে, 'এ তো একরকম আত্মহত্যাই। এ খবর আপনি জানেন, অথচ একদিনের জন্যে উচ্চারণ করেননি? আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য হচ্ছেন? এটাও আমার পক্ষে আশ্চর্য। আমি যে কত বড়ো নিষ্ঠুর সেটা বুঝি এতদিনও টের পাননি?'

'না পাইনি। কারণ সত্যি নিষ্ঠুর আপনি নন। করুণাপদর ব্যাপারও তো দেখলাম। শুধু ওই হতভাগা ব্রজেন ঘোষের বেলাতেই—আপনি বলেছিলেন টাকা ছিল না। কিন্তু উনি যখন মারা গেলেন, অনেক টাকা ছিল আপনার কাছে। একগোছা নোট নিয়ে দিতে এসেছিলেন আমাকে—'

হঠাৎ হেসে ওঠে লীলা। খুব একটা কৌতুকের হাসি। বলে, 'এই আপনাদের মতো লোকদের দেখলে আমার বড়ো মায়া হয়। টাকার রহস্যটা বুঝি ফাঁস করিনি এখনও? তাহলে করেই ফেলি, কি বলুন? ঘরে নেই টাকা, অথচ চোখে আছে চক্ষুলজ্জা। দেখুন কী বিপদ? ভেবে দেখলাম এর একমাত্র সমাধান চুরি করা—'

'চুরি করা।' স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন কমলাক্ষ।

লীলা তেমনি হাসতে হাসতেই বলে, 'না তো কি! বিশ্বসুদ্ধ লোকই তো কোনো না কোনো বস্তু চুরি করছে, ওতে আর দোষ কি? আর চক্ষুলজ্জার দায়ে চুরি ডাকাতি তো—যাক ওইসব ভেবে চটপট সমাধানটা করে নিলাম আর সেই চুরির টাকাটা আপনাকে দিতে এলাম।'

'কক্ষনো না'। কমলাক্ষ চটে ওঠেন, 'যা তা বোঝাতে এসেছেন আমাকে? সেই অবস্থায় আপনি গেলেন চুরি করতে? আর এ আপনার পলাশপুরের লোক এত বেহুঁশ যে দিন দুপুরে বাক্স আলমারি খুলে রেখে ঘুমোচ্ছিল আপনার সুবিধের জন্যে।'

লীলার চোখে কৌতুক। লীলার চোখে বিচিত্র এক দৃষ্টি। আর বুঝি বা লীলার চোখে জল।

'পলাশপুরের লোক বেহুঁশ একথা কে বললে আপনাকে? না পলাশপুরের লোক এত বেহুঁশ নয়। বেহুঁশ হচ্ছে কলকাতার লোক, যারা খোলা সুটকেসে, বইয়ের পেজ মার্কে নোটের গোছা রেখে দিয়ে চোরের সুবিধে করে রাখে।'

বৃষ্টি পড়ছিল।

গ্রীষ্মের আকাশে নতুন মেঘ। কমলাক্ষর জানালা দিয়ে ঝাপটা আসছিল, তবু খোলা রেখেছিলেন। আর ভাবছিলেন, এমন আশ্চর্য মেয়ে কি তিনি জীবনে কখনও দেখেছেন? যে-মেয়ে নিজের মুখে স্বীকার করতে পারে, যার সঙ্গে বসবাস করি আমি, সে আমার স্বামী নয়। স্বীকার করতে পারে একটা লুঠেরা তাকে লুটে নিয়ে গিয়ে ধ্বংস করেছে, স্বীকার করতে পারে চক্ষুলজ্জার দায়ে চুরি করতে তার বাধে না। যার ধার ধারে তার বাক্স খুলে চুরি করেই ধার শোধ করতে আসতে পারে সে!

আশ্চর্য! তা সত্যি। তবু মেয়ে। কমলাক্ষ কি করে পারবেন তার দায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তা না করতে? অথচ লীলা কিছুতেই এই সহজ কথাটা বুঝতে চাইছে না। বলছে, 'আমার জন্যে আপনি ভাবতে যাবেন কেন?'

কেন কি! মানুষ মানুষের জন্যে ভাববে না?

কমলাক্ষ ঠিক করলেন, লীলাকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন, যাতে সেখানেই ওর কোনো একটা কাজকর্ম জোগাড় হয়, তার ব্যবস্থা করে দেবেন। একা থাকবে? তা একা তো ওকে থাকতেই হবে বাকি জীবনটা। তবু কমলাক্ষ তো কাছেই থাকবেন, দেখাশোনা করবেন।

পলাশপুরের এই বাড়িটা! এ-বাড়িটা তো লীলার কাছে মিথ্যা হয়ে গেল। লীলা তো আর 'প্রবাস বোর্ডিং' চালাবে না। বাড়িটা বিক্রি করে বরং লীলার কিছু টাকার সংস্থান করে দিতে পারলে—

মনটা কেমন খচ্ করে উঠল। এই বাড়িটা আর লীলার থাকবে না? কমলাক্ষ জীবনে আর কোনোদিন ওই দক্ষিণের জানলাটা খুলে দিয়ে মাঠের অন্ধকারে চোখ ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পাবেন না?

হঠাৎ মনে হল কমলাক্ষই যদি বাড়িটা কিনে নেন? মানুষ কি এমন মফঃস্বলে বাড়ি-টাড়ি কেনেন? ছুটির সময় মাঝে মাঝে হাঁফ জিরোতে? সেই বেশ। সেই ঠিক। ছুটির সময় লীলারও তো ছুটি-টুটি হবে?

কমলাক্ষ বলবেন, 'চলুন ক'টা দিন পলাশপুরে কাটিয়ে আসা যাক।'

কল্পনার যৌক্তিক অযৌক্তিকটা মাথায় এল না, একটি জ্যোতির্ময় স্ফটিকের ভেলায় চড়ে সেই কল্পনার সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন কমলাক্ষ।

বৃষ্টির শব্দ বহির্জগৎকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে বাজতে লাগল ঝিম্ ঝিম্ ঝির্ ঝির্।

'মুখুজ্জেবাবু!'

একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে দেওয়াল ধরে ধরে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা। ও যে করুণাপদ, তা বুঝতে সময় লাগল কমলাক্ষর। বুঝে চমকে উঠে বললেন, 'কিরে, তুই আবার এই ঠাণ্ডায় বাইরে এসেছিস কেন?'

'কম্বল মুড়িয়েছি।'

'তা বেশ করেছ। কিন্তু কি দরকার? কি বলতে এসেছিস্?'

'আজ্ঞে বলছিলাম কি, আমি আর দেশে যাবার জন্যে বায়না করব না।'

স্ফটিকের ভেলাটা একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় উল্টে গেল, কমলাক্ষকে আছড়ে ফেলে দিল বালির চড়ায়। কমলাক্ষ সেই আছাড়ের ধাক্কায় ছিটকে উঠলেন।

'বায়না করবে না! চমৎকার! তা কেন করবে না সেটি শুনতে পাই না?'

'আজ্ঞে তখন অসুখের ঘোরে বাড়ি বাড়ি মন করেছিল। এখন চিন্তা করে দেখছি চলে গেলে মায়ের অসুবিধে।'

'মায়ের অসুবিধে! চিন্তা করে দেখছ!' কমলাক্ষ চৌকী ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওর কাছে সরে এলেন, ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ মিশ্রিত চড়া গলায় বলে উঠলেন, 'খুব যে চিন্তাশীল হয়ে উঠেছ দেখছি। বলি, আবার যদি তুমি জ্বরে পড়, মায়ের সুবিধেটা কোথায় থাকবে, সেটা চিন্তা করে দেখেছ?'

'আবার জ্বরে পড়তে যাব কেন?'

'যাবে কেন? হুঁঃ! যাবে, নিশ্চয় যাবে। এই এখন থেকে হাটে-ফাটে গেলে পড়তেই হবে। না না, তুমি দেশেই চলে যাও।'

'রাগ করছেন কেন বাবু? রোগের ঝোঁকে 'গোঁ' ধরেছিলাম বই তো নয়। এখন মায়ের কথাটা তো ভাবতে হবে।'

'ভাবতে হবে?' কমলাক্ষ উত্তেজিতভাবে বললেন, 'না ভাবতে হবে না। কেন, তুমি ছাড়া তোমার মায়ের জন্যে ভাববার আর লোক নেই?'

কমলাক্ষর স্বভাব তো এমন ছিল না। কমলাক্ষ আজকাল বড়ো বেশি উত্তেজিত হচ্ছেন যেন। হঠাৎ স্বভাবটা এমন বদলে গেল কেন কমলাক্ষর?

'কী হচ্ছে?' লীলার প্রশ্নটা প্রায় একটা ধমকের মতো এসে ধাক্কা দেয়। 'ও বেচারা রোগা মানুষ, ওকে বকাবকি করছেন কেন? আমিই তো ওকে বলেছি, এখন দেশে গেলে চলবে না বাপু। কে বোর্ডিং-এর দেখাশোনা করবে?'

'কে দেখাশোনা করবে!' কমলাক্ষ ফের চৌকীতে বসে পড়ে বলেন, 'তা হলে হোটেল চলবে?'

'চালাতে হবে। পেটটা তো চলা চাই?'

'পেট চালাবার জন্যে ওই করুণাপদকে ভরসা করে এই শত্রুরাজ্যে বসে হোটেল চালিয়েই চলবেন?'

'তাই তো চালিয়ে এলাম এতদিন। করুণাপদই তো সব দেখেছে। মালিক আর কতই বা দেখেছেন! ইদানীং তো—'

'তা হোক!' কমলাক্ষ ভারী গলায় বলেন, 'তবু ব্রজেনবাবু ছিলেন। সেই থাকাটাই মূল্যবান। এখন এই নিরভিভাবক অবস্থায়—না না, সে তো একেবারেই হতে পারে না।'

'ভাবছেন কেন? আমি ঠিক চালিয়ে নেব।'

'চালিয়ে নেবেন!' কমলাক্ষ বলে ওঠেন, 'নেবেন বলেই নিতে দেব? আমি বলছি এ-খেয়াল আপনাকে ছাড়তে হবে।'

লীলা একটুক্ষণ থেমে থেমে আস্তে বলে, 'আপনি বললে, ছাড়তেই হবে। কিন্তু আমার দায়িত্বটা আপনার কর্তব্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেলে আপনার জীবনেও তো অনেক জটিলতা এসে দেখা দেবে।'

কমলাক্ষ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'জীবন যখন আছে, তখন তার জটিলতাও থাকবে।'

গগন গাঙুলী পাশের প্রতিবেশীর দাওয়ায় উঠে এসে বলেন, 'বুঝলেন মশাই, এখন বুঝছি—কলকাতার ওই প্রফেসরটি? ওটি হচ্ছে একটি চরিত্রহীন লোক। কে জানে মশাই নাম পরিচয় সত্যি কি না। নইলে—মানে বিশ্বাস করবেন, লোকটা এই মাসাধিককাল ধরে পড়ে আছে আমাদের ব্রজেনবাবুর—না ব্রজেনবাবুর আর বলি কি করে—ব্রজেন গিন্নির হোটলে। আমার সন্দেহ হচ্ছে এই ভদ্রলোকের আগমনে, আর ভাবগতিক দেখেই ব্রজেন ঘোষটা মনের ঘেন্নায় সুইসাইড করেছে। এদিকে তো আবার লোকটা ইয়ে, খুব সেন্টিমেন্টাল ছিল তো? আপনার কাছে গল্প করেছিলাম মনে আছে বোধ হয়, সেই যেবার আমার বড়ো শালীর মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সব ওই 'প্রবাস আবাসে' সিট নেওয়ায় ওনাদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল?...মনে নেই? বলেন কি? আহা হা—সেই যে, আমার বাড়িতে কুটুমরা এসে পড়েছে, অথচ গিন্নির শরীর খারাপ, ঠেলে তাদের পাঠিয়ে দিলাম এই হোটেলে। আর আমার নাতজামাইয়ের দিদি এসে প্রকাশ করে দিল, মাগী বিয়ে করা বর বলে যাকে চালাচ্ছে, সে লোকটা আসলে ওর বাবার চাকর! ওকে নিয়ে ফেরার হয়েছে। সেই সেবার দেখেছি তো।

'যখন ডাকিয়ে এনে প্রশ্ন করলাম—খবর সত্যি কি না, তখন ব্রজেনের যা অবস্থা দেখেছিলাম! লজ্জায় বুঝি মারাই যায়। দেখে আশ্চর্যই লাগল যে এই লোক এই কাজ করেছে! এখন বুঝছেন তো কে করেছে? ওই মেয়েমানুষটি। এবার এটি বোধ হয় নতুন প্রেমিক জুটিয়েছেন।'

প্রতিবেশী ইতস্তত করে বলেন, 'কিন্তু ভদ্রমহিলাকে দেখলে তো ঠিক তা মনে হয় না।'

'শুনুন বিত্তান্ত। দেখলেই যদি চেনা যাবে, তবে আর 'ছেনাল' বলছে কেন? ওই দেখতে যেন কতই আরিস্টোক্র্যাট। আরে মশাই, আমরা মানুষ চিনি। বলে কত অ্যারিস্টোক্রেসি ধুয়ে জল খেলাম। ওই আপনার প্রফেসরটিকেও তো প্রথম দেখে তাই মনে হয়েছিল। এখন দেখছেন তো প্রবিত্তি? দুদিন দেখেই হোটেলওলির সঙ্গে মজে গেলেন।...ওই যখনই দেখেছি এ পথ দিয়ে হাঁটা ছেড়েছে, তখনই

বুঝেছি 'ব্যাপার' আছে। আমার তো ধ্রুব বিশ্বাস কোনোরকম বাড়াবাড়ি দেখেই হতভাগা ঘোষটা মরে কেলেঙ্কারি করল। কে জানে চাকর ছোঁড়াটাকেও ভবধাম থেকে সরাবার তোড়জোড় চলছিল কি না।...ডাক্তারবাবুকে ধরে পড়েছিলাম। তা ডাক্তারবাবু বললেন, না, না টাইফয়েড। বিশ্বাস হল না। নির্ঘাৎ টাকা খাইয়েছেন।...যাক, ছোঁড়া নাকি এ-যাত্রা বেঁচে গেছে। তা রাখবে না, দেশে পাঠিয়ে দেবে। তারপর বোধ হয় মাগীকে নিয়ে ভাগবে। বয়সের গাছ পাথর নেই মশাই এদের সব, তবু দেখুন কী প্রবিত্তি!'

প্রতিবেশীটি গগন গাঙুলীকে ডরান। তাই প্রতিবাদের সাহস পান না। শুধু বলেন, 'আপনি এত সব জানলেন কি করে?'

'আমি? জানলাম কি করে বলছেন? হুঁ! ওইটুকুই সম্বল করেই তো বেঁচে আছি মশাই। নইলে এই পলাশপুরে কি মানুষ টিঁকতে পারে? যাই দেখি শ্রাদ্ধ আর কতদূর গড়ায়।'

ব্রজেন ঘোষেদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাবার পর থেকে 'প্রবাস আবাসের' খদ্দেরের মন ভাঙানোই পেশা হয়েছে গগন গাঙুলীর। ঠিক যেমন তার আগে পেশা ছিল হোটেলের খদ্দের জোগাড় করবার। নিত্য দু'বেলা ট্রেনের সময় স্টেশনে হাজির হতেন গগন গাঙুলী, আর যাত্রী দেখলেই বলতেন, 'উঠবেন কোথায়? বাড়ি ঠিক করে এসেছেন? বিদেশে বেড়াতে এসে মিথ্যে কেন রাঁধাবাড়ার ঝঞ্ঝাটে জড়াবেন মশাই? গেরস্ত পরিচালিত ভালো বের্ডিং রয়েছে। চার্জ কম খাওয়াদাওয়া ভালো, ঘর কমফর্টেবল—।'

কিন্তু ওই তাঁর নাতনীর ননদ দ্বারা পরিবেশিত সংবাদের পর থেকেই পেশা বদলে গেল গগন গাঙুলীর। হঠাৎ তাঁর মাথায় ঢুকল ওই শুঁটকো ব্রজেন ঘোষ আর ওই দেমাকি মেয়েটা তাঁকে বেদম ঠকিয়েছে।

তিনি গগন গাঙুলী, তাঁর নাকে দড়ি পরিয়ে ঘুরিয়েছে ওরা! সেই অবধি খদ্দের ভাগানোই পেশা করেছেন।

তা এ-যুগে লোক খুব একটা বিচলিত হয় না ওতে। স্বামী-স্ত্রী নয়, তবু স্বামী-স্ত্রী সেজে ব্যবসা চালাচ্ছে—এ এমন একটা কিছু নতুন কথা নয়।

খাওয়া ভালো, যত্ন ভালো, থাকার ঘর ভালো, চার্জ কম, এ কি সোজা নাকি? খদ্দের ভাঙে না। সিজনের সময় লোক ধরে না। জায়গা পায় না।

সেই কথাই বলে করুণাপদ, 'এখন এই রকম দেখছেন বাবু, সিজিনের সময় ঠাঁই দেওয়া যায় না। একটা ঘরে দু-তিনটে সিট্ করতে হয়। এমন একটা চালু ব্যবসা তুলে দেবেন?'

'সিজনের সময় লোক ধরে না?' কমলাক্ষ অবাক হয়ে বলেন, 'তবে তোমার মার এত অর্থকষ্ট কেন?'

করুণাপদ ঘাড় নীচু করে বলে, 'সে আজ্ঞে বলতে গেলে বাবুর কারণেই।'

'ওরে করুণা গল্প রাখ। দেখ বাইরে বোধ হয় রিকশা এল'—লীলা এসে ডাক দেয়, 'ছুটে যা। জানি না কে, যদি খদ্দের হয়, বলবি সিট্ নেই।'

'বলব সিট্ নেই!'

'বলবি বইকি।'

'তা হলে তুলেই দিচ্ছেন? তবে যে আমায় বললেন, করুণা তুই—'

'আরে বাবা সওয়াল সাক্ষী রাখ এখন। ছুটে যা—'

কিন্তু যেতে আর হল না করুণাপদকে, ততক্ষণে একটি অষ্টালঙ্কারভূষিতা মহিলা বাড়ির মধ্যে ঢুকে এসেছেন। একেবারে কমলাক্ষর সামনা-সামনিই দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

কমলাক্ষ উঠে দাঁড়ান। স্খলিত স্বরে বলেন, 'এ কী!'

মহিলাটি কঠিন মুখে বলেন, 'আমিও আপনাকে ঠিক সেই প্রশ্ন করছি বাবা!'

অন্ধকারের পৃষ্ঠপটে ফুটে উঠেছে আলোকবিন্দু, নিশ্চেতন জড়তার স্তর থেকে উঠে আসছে চেতনার বুদ্বুদ, আতঙ্কের পঙ্ক থেকে জন্ম নিচ্ছে সত্যের শুভ্র কমল।

হঠাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে এল বলে দিশেহারা হলে চলবে না, খুলে ধরতে হবে বন্ধ দরজায়। কমলাক্ষ তাঁর সন্তানকে ভয় করবেন না। তাঁর আর নীরজার।

'ভর রোদ্দুরে এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে গগনবাবু? কী ব্যাপার?'

গগন গাঙুলী সোলার-হ্যাটটা মাথায় চেপে বইয়ে নিয়ে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি একটি রগড় দেখার আশায়।'

প্রতিবেশী মৃদু হাসেন। 'এতও রগড় জোটে আপনার!'

'জুটবে না মানে? ওই তালেই থাকি যে। দুটি বেলা স্টেশন পাহারা দিতে যাই কি আর বেগার খাটতে? এই পলাশপুরে কে মাথাটি ঢোকালো, তার খবরটি নখদর্পণে রাখি। আজ তো জালে একমুনী রুই—'

প্রতিবেশীর কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে আসেন। বলেন, 'মেয়ে! বুঝলেন? নিজে এসে হাজির হয়েছে। বাপের চুলের মুঠিটি চেপে ধরে নিয়ে যেতে—'

কে, কার, কি বৃত্তান্ত শ্রোতার অবিদিত। তাই তিনি বোধকরি রহস্য আরও ভেদ হবার আশায় 'হাঁ' করে তাকিয়ে থাকেন।

গগন গাঙুলী সোলা-হ্যাট সমেত মাথাটা ঝাঁকিয়ে নেন, 'কী মশাই, হাঁ হয়ে যে? ধরতে পারেননি? নাঃ, রসবোধ বড়ো কম মশাই আপনাদের। প্রফেসরের মেয়ে! এই এগারোটার গাড়িতে এল!' গগন গাঙুলী অকারণেই গলাটা নামিয়ে ফিসফিস করে বলেন, 'বাপের টুঁটিটি টিপে নিয়ে যেতে এসেছে।'

প্রতিবেশী অবাক হন। 'কি করে জানলেন?'

'হু হুঁ বাবা! বুঝতে হলে ব্রেন চাই। আর সেই ব্রেনের চাষ করছি কি আজ থেকে? পলাশপুর স্টেশনে পা দিয়েই খোঁজ করেছে ফেরবার গড়ি কখন আছে, টাউনের ভেতর রিকশা-টিকশা পাওয়া যায় কি না। রিকশাওয়ালারা সব রাস্তা চেনে কি না। পারলাম না স্থির থাকতে, এগিয়ে গেলাম। বললাম, কোন্ বাড়িতে যাবে মা লক্ষ্মী! তা মেয়ে তো নয়, যেন আগুনের ডেলা। বলল, জেনে আপনার কী দরকার? শুনুন! ভদ্রলোকের কথা শুনুন! তবু মান খুইয়ে বললাম, আমার আর কিসের দরকার? এই একটু পরোপকার করার ব্যাধি আছে তাই—

'শুনে একটু নরম হল। বলল, 'প্রবাস-বোর্ডিং' বলে কি হোটেল আছে—

'মনকে বলি, ওরে মন, যা ভেবেছিস তাই। আহ্লাদ চেপে বললাম, 'হ্যাঁ জানি বইকি, ওই দিকেই তো এই অধম ছেলের বাস।...তা বলব কি আপনাকে এমন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল, যেন বুকের ভেতর পর্যন্ত সার্চলাইট ফেলল। তারপর কাঠ কাঠ মুখে বলল, ও বুঝেছি। আচ্ছা রিকশাওলাকে জায়গাটা একটু বুঝিয়ে দিতে পারেন তো—

'বুঝিয়ে আর কাকে দেব? রিকশাটা তো আমাদের সীতারামের।...তো আমি বলে যাচ্ছি আমিও—'

প্রতিবেশী ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে বলেন, প্রফেসরের মেয়ে, একথা কে বলল? কোনো বোর্ডারও হতে পারে।'

'বোর্ডার! হাসালেন মশাই। ফিরতি ট্রেনের খোঁজ নিচ্ছিল শুনলেন না? আমি বলছি মেয়ে

ছাড়া আর কিছু নয়। মুখের সঙ্গে আদল আছে। বলি আর কে হবে? ওই বয়সের মেয়ে তো আর স্ত্রী নয়?...ওই বাপের অধঃপতনের খবর পেয়ে—মানে কানা-ঘুসো কিছু শুনে থাকবে এই আর কি। তা বলি এই তো ঘণ্টা দেড় বাদেই ট্রেন, যাবে তো এই পথেই। দেখি একা যায়, না সঙ্গে—'

'নমস্কার মশাই আপনার এনার্জিকে'—ভদ্রলোক হেসে উঠে চলে যান, 'এই ঠায় রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে—'

'কী করি বলুন। কৌতূহল বড়ো বালাই দাদা!'

শুধু কৌতূহল কেন, গরজও বড়ো বালাই। সবচেয়ে বড়ো বালাই। নইলে উদ্ধতস্বভাব উন্নাসিক মেয়ে সোমা, ব্রজেন ঘোষের হোটেলে এসে হাজির হয়?

আকৃতিতে তরুণী, প্রকৃতিতে মহিলা। পাথর কুঁদে বার করা মুখ দেখলে মনে হয় সে-মুখে যেন বাটালির দাগ রয়ে গেছে, পালিশে মসৃণ হয়ে ওঠেনি।...সেই অমসৃণ মুখের প্রলেপিত ঠোঁট দুটোর কপাট দুটো একটু ফাঁক হয়, যার মধ্যে থেকে কথাটা বেরোয়, অনুগ্রহ করে আপনি একটু বাইরে যাবেন?'

অনুরোধ নয়, আদেশ। অনুরোধের ছদ্মবেশেই এল। ভদ্রসমাজের যা দস্তুর।

কমলাক্ষর মুখ তাঁর মেয়ের মতো অমসৃণ নয়, পাথুরেও নয়, তবু এখন যেন পাথর পাথরই লাগছে। 'হঠাৎ এভাবে তোমার আসার কারণ কি সোমা?'

'কারণটা আপনি নিজেই নির্ণয় করুন বাবা!'

'নির্ণয় করা শক্ত হচ্ছে বলেই তো জিগ্যেস করছি। ষোলো তারিখে আমার যাবার কথা ছিল, আর আজ মাত্র আঠারো তারিখ, এই দু-দিনেই তুমি এত অস্থির হয়ে উঠলে যে—তা ছাড়া আমি টেলিগ্রামও করেছি।'

'করেছেন। কিন্তু যেতে না পারার কারণ কিছু দর্শাননি।'

কমলাক্ষ গম্ভীর হয়ে গেছেন। দৃঢ় হয়ে গেছেন। বললেন, 'কারণ দর্শাতে হবে, সেটা অনুমান করিনি। যেতে পারলাম না, সেটাই কি যথেষ্ট নয়?'

'না নয়! আপনার ভাবা উচিত ছিল, আমরা দুশ্চিন্তায় পড়তে পারি। ধরে নিতে পারি আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—'

'ইচ্ছে করলে অবিশ্যি সবই পার। কিন্তু চিন্তাকে অতদূর না পাঠালেও পারতে সোমা! সব কিছুরই একটা মাত্রা থাকা দরকার।'

'দরকার! মাত্র থাকা দরকার! তাই না বাবা? কিন্তু সেটা কি শুধু ছোটোদের বেলা? বড়োরা মাত্রাছাড়া যা খুশি করলেও দোষ নেই?'

কমলাক্ষ গম্ভীর হলেন। 'সোমা তুমি তো জান ছেলেমেয়েদের তিরস্কার করা আমি পছন্দ করি না। তাছাড়া তুমি বড়ো হয়েছ।'

সোমা বাপের এই সামান্যতম ইঙ্গিতে থামে না। তেমন অভিমানী প্রকৃতির মেয়ে হলে, এই দুঃসাহসিক অভিযানের পথে পা বাড়াত না সে। তাই ইঙ্গিত গায়ে না মেখে বরং নিজের ভঙ্গিতেই আরও অগ্রাহ্যের ভাব আনে।

'বড়ো হয়েছি বলেই ছোটোর মতো মুখ বুজে অন্যায় মেনে নেওয়া শক্ত হল বাবা! হাল ধরতেই হল। আমি এসেছি, ফিরতি ট্রেনেই যাব, আপনাকে নিয়ে যাব।'

'আমাকে নিয়ে যাবে?' সহসা হেসে ওঠেন কমলাক্ষ, 'নিয়ে যাবে কি বল? আমি কি ছেলেমানুষ শিশু, যে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবে?'

সোমার সেই বাটালির দাগ-থেকে-যাওয়া মুখটা আর একটু অমসৃণ দেখায়। সোমার গলার স্বর

প্রায় ধাতব হয়ে ওঠে। 'বুড়োমানুষরা যখন ছেলেমানুষী করে, সেটা আরও বেশি অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে বাবা, আর তখন তাদের ওপর জোর ফলানো ছাড়া উপায় থাকে না। আমি বলছি আমার সঙ্গে আপনাকে যেতেই হবে। কোথায় আপনার জিনিসপত্র? দেখিয়ে দিন গুছিয়ে নিই।'

সোমা ঘরের এদিক-ওদিক তাকায়।

কিন্তু কমলাক্ষ সে ভঙ্গিকে আমল দেন না। শান্ত আর নরম গলায় বলেন, 'তুমিও বড়ো হয়েছ সোমা, তোমাকেও আর ছেলেমানুষী মানায় না। একা এসেছ তুমি? না সঙ্গে কেউ আছে?'

'বৃন্দাবন আছে। তাকে স্টেশনে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

বিরস ভারী গলায় কথা বলছে সোমা। মনে হচ্ছে, যেন একটা গিন্নি। বুদ্ধিটাও তার গিন্নিদেরই মতো। বৃন্দাবন ওর বাড়ির চাকর। তার সামনে পাছে কোনো দৃশ্যের অবতারণা হয়, তাই তাকে স্টেশনে বসিয়ে রেখে এসেছে।

অতএব দৃশ্যের অবতারণা করে চলে। বিদ্রূপে মুখ কুচকে বাপের মুখের ওপর বলে চলে, 'আপনি তাহলে কি ঠিক করেছেন? সংসার ত্যাগ করবেন?'

'সোমা, অসভ্যর মতো কথা বোলো না।'

সোমার বুক কাঁপে না। সোমা জাঁহাবাজ। সোমা তার মায়ের প্রকৃতি পেয়েছে। যে মা তাকে তিন বছরের রেখে মারা গেছে। হ্যাঁ, নীরজাও এমনি জবরদস্ত প্রকৃতির ছিল। অতটুকু বয়সেই সে-পরিচয় রেখে গিয়েছিল সে।

তাই সোমা বলে, 'সংসারের সর্বত্র যদি সভ্যতা বজায় থাকে, তা হলে কাউকেই অসভ্য হবার দুঃখ পেতে হয় না বাবা! আপনি যদি—'

কথার মাঝখানে করুণাপদ এক গ্লাস চিনির শরবৎ নিয়ে এসে দাঁড়ায়। এবং সাহসে ভর করে এগিয়েও ধরে সোমার দিকে।

সোমা একবার কুলিশ কঠোর দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে কঠিন স্বরে বলে, 'দরকার লাগবে না, নিয়ে যাও।'

করুণাপদের হাত কেঁপে খানিকটা শরবৎ চলকে মাটিতে পড়ে, করুণাপদ পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

কমলাক্ষ ক্ষুব্ধ হেসে বলেন, 'ছেলেমানুষীতে তো কেউ কম যায় না। রোদে ট্রেনে এসেছ, ওটা খেলেই পারতে।'

'খাবার মতো মনের অবস্থা থাকলে ঠিকই খেতাম। সে যাক আপনি আমার কথার উত্তরটা কিন্তু দেননি।'

'কোন্ কথার?' কমলাক্ষ অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। কমলাক্ষ জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন প্রখর দুপুরের আকাশে উড়ন্ত এটা নিঃসঙ্গ চিলের দিকে। চিলটা অবিরত একই বৃত্তে পাক খাচ্ছে।

আশ্চর্য তো! কিন্তু কেন? মানুষের মতো ওরাও কি আপন হাতে বৃত্ত রচনা করে শুধু সেই পথেই পাক খায়? ওদের তো ডানা আছে, ওদের এ-দুর্মতি কেন? আবার ভাবলেন মানুষেরও একদিন ডানা ছিল। সে-ডানা মানুষ নিজেই ভেঙেছে। মানুষ আকাশ হারিয়েছে, কিন্তু তার বদলে কতটা মাটি পেয়েছে?

ভাবছিলেন, তাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তাই বলেন, 'কোন্ কথার?'

সোমা দাঁতে ঠোঁট চেপে ঠোঁটের রঙের অনেকখানি ঘুচিয়ে ফেলে দাঁতে-চাপা স্বরে বলে, 'আপনি কলকাতায় ফিরবেন কি না, সেই প্রশ্নটার উত্তর পাইনি।'

'কলকাতায় ফিরব কি না!' কমলাক্ষ অবাক গলায় বলেন, 'এটা একটা প্রশ্ন হল?'

'ধরুন ওইটাই আমার প্রশ্ন?'

'কিন্তু ফিরব কি না এমন অদ্ভুত প্রশ্ন তুমি তুলবেই বা কেন? কলকাতায় ফিরব না? আমার কলেজ নেই?'

এবার সোমার সেই পাথুরে মুখে এতটুকু একটু অভিমানের কোমলতা এসে লাগে। 'কি জানি আপনার কি আছে, আর কি নেই। অন্তত এই ছত্রিশ দিনের মধ্যে আপনার মনে ছিল না, আপনার একটা ছেলে আছে, একটা মেয়ে আছে, তাদের মা নেই।'

কমলাক্ষ মৃদু হাসেন। বলেন, 'ছেলেমেয়েদের মা নেই'টা এত তামাদি হয়ে গেছে সোমা, যে সত্যিই মনে থাকে না। কিন্তু ছেলেমেয়েরা আছে এটা ভুলে যাচ্ছি, এতদূর ভাবতে বসেছিস্ কেন বল্ তো? চিঠিপত্র বিশেষ দিইনি বলে?'

'বিশেষ' বলছেন কেন বুঝছি না।'

'ওঃ তা বটে। তোকে আদৌ দেওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু জানিস তো চিঠিপত্রের ব্যাপারে আমি চিরদিনের কুঁড়ে।'

কমলাক্ষ ভাবলেন, তবে কি যা ভাবছিলাম তা নয়। শুধু অভিমান? চিঠি দিইনি, ফেরার দিন ফিরিনি, তাই রাগে দুঃখে—

সোমা হাত তুলে ঘড়ি দেখে বোধ করি নতুন হাতিয়ার সংগ্রহ করবার আগে অবহিত হতে চায় হাতে কতটা সময়।

ওর ওই ঘড়ি দেখার মুহূর্তে ঘড়ির ওপর ছায়া পড়ে। আর সেই ছায়া কথা কয়ে ওঠে, 'শরবৎটা ফেরত দিলে কেন? খাও না বুঝি? তা হলে একটু চা—'

সোমা বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমাকে 'তুমি' বলবার অধিকার আপনাকে কে দিল শুনতে পেতে পারি?'

কমলাক্ষ চমকে উঠলেন। কমলাক্ষ আপন আত্মজার অসভ্যতায় লাল হয়ে উঠলেন। কিন্তু লীলার মধ্যে ভাবান্তর দেখা গেল না। সে শুধু উত্তরটা দিল। সহজ ভাবেই দিল। 'অধিকার কি আর হাতে করে কেউ তুলে দেয়? তা ধর যদি কেউ দিয়েই থাকে, আমার বয়েসই দিয়েছে।'

সোমা কিন্তু ঠিক এমন উত্তরটা আশা করেনি। তাই সোমা এর আগে যার দিকে তাকিয়ে দেখবার প্রবৃত্তি খুঁজে পায়নি—তার দিকে এখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে? কিন্তু তাকিয়ে দেখে সোমা হতাশ হচ্ছে নাকি? বিতৃষ্ণ হচ্ছে?

ওর চোখে মুখে কি এই প্রশ্নই ফুটে উঠছে না—এই! এই একেবারে সাধারণের সাধারণ। না রং, না গড়ন, না মুখশ্রী, এর মধ্যে আকর্ষণীয় কি আছে? যে-আকর্ষণ পাহাড় টলায়?

তবে কি সোমাকে কেউ বোকা বানিয়েছে, কুৎসিত একটা কৌতুক সৃষ্টি করে? আর বোকা সোমা সেই কৌতুকের তালে নেচে—কিন্তু তাই কি? বাবার আচরণ, বাবার চেহারা, কোন্ পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে?

না, সোমা বাবার মুখের সাক্ষ্যই নেবে। তাই সামনের মানুষটার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললে, 'ওঃ বয়েস! মফঃস্বলের দিকে সেই রকম একটা হিসেব ধরা হয়ে থাকে বটে। যাক কষ্ট করে আর আপনাকে শরবতের বদলে চা করতে হবে না। আমি এখানে খেতে আসিনি।'

'আশ্চর্য! আমিই কি তা বলছি? তবু ছেলেমানুষ—রোদে এসেছ—'

'থাক, এত স্নেহ প্রকাশের দরকার নেই। দয়া করে বারে বারে এসে ব্যাঘাত ঘটাবেন না। আমাকে আমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে দিন একটু।'

লীলাও তাহলে সোমার মতোই পাথর! তাই এ-কথার পর অপমানে বিবর্ণ হয়ে সরে না গিয়ে সহজেই বলতে পারল কি করে, 'কিন্তু ওঁর যে এখন খাওয়ার সময় হয়েছে!'

'ওঃ! সময় হয়ে গেছে! বাবা, আপনি তাহলে খুব যত্নটত্ন পাচ্ছেন। তাই বুঝি আর নিজের সংসারে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না? সত্যি সেখানে আর কে কখন ঘড়ি ধরে খাওয়াচ্ছে! কিন্তু আজ না হয় সময়টা একটু উত্তীর্ণই হল।'

কমলাক্ষ বিচলিত হন, চঞ্চল হন, উত্তেজিত হন। আর সেই তিনটে অবস্থা একটা স্বরের মধ্যে ফেলে বলে ওঠেন, 'সোমা, পাগলামীরও একটা সীমা আছে।'

সোমা কিছু উত্তর দিত কিনা কে জানে। তার আগেই লীলা শান্ত গলায় বলে, 'মিস্টার মুখার্জি, আপনার মেয়েকে একটু বুঝিয়ে দিন, এটা বাড়ি নয়, হোটেল। এখানে খাওয়া-দাওয়ার একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকে, আর সেটা মেনে চলতে হয়।'

লীলা চলে যাবার পর কমলাক্ষ বলেন, 'সোমা তুমি তাহলে ঝগড়া করবে বলেই কোমর বেঁধে এসেছে? জানি না কেন তোমার এ-দুর্মতি হয়েছে, কিন্তু—'

'জানেন না? কেন তা জানেন না?' সোমা বিদ্যুতের দ্রুততায় হাতের ভ্যানিটিটা খুলে একখানা চিঠি বার করে বাপের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এই চিঠিটা আপনি অস্বীকার করতে পারেন?'

চিঠিটা কি বাবদ, কার লেখা এসব প্রশ্ন না করে—হাত বাড়িয়ে নিয়ে খুলে চোখের সামনে তুলেই ধরেন কমলাক্ষ। আর মিনিট খানেক চোখ বুলিয়েই সেটা ঠেলে সরিয়ে রেখে সোমার চোখে চোখ ফেলে বলেন, 'তোমার বাপের নামে কুৎসা করা একটা উড়ো চিঠি তোমাকে এতটা বিচলিত করে তুলেছে এটা আশ্চর্য।'

'শুধু চিঠি?' সোমা তীব্র স্বরে বলে, 'নিজের চক্ষে দেখলাম না আমি? প্রমাণ পেলাম। আপনি গুরুজন, তবু মুখের ওপরেই বলব, আপনার বয়সের কথা ভেবে আর রুচির চেহারা দেখে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার। তবু আপনার কাছে হাতজোড় করছি বাবা, আপনি এই আবেষ্টন থেকে চলুন।'

কমলাক্ষও বুঝি ওদের মতো হয়ে যাচ্ছেন। তাই মেয়ের কাছ থেকে অতখানি অপমান পেয়েও গায়ে মাখলেন না। উল্টে হেসে উঠে বললেন, 'আমার কাছে হাতজোড় করবে, সেটা আর বাহুল্য কি? আমি তাতে কুণ্ঠিতও হব না। কিন্তু আমি কলকাতায় যাব না, একেবারে চিরকালের মতো এইখানেই থেকে যাব, এমন অদ্ভুত ভয়ে কাতর হবার মানে কি তাই ভাবছি।'

'বেশ, যাবেন তো আজই চলুন।'

'তা কি হয়?'

'তা হয় না?'

'না। ছুটি শেষ হবার পরও যখন থাকতে হয়েছে—ধরে নাও বিশেষ কোনো কাজে আটকে পড়েছি।'

সোমা ছিটকে ওঠে। সোমা চটির মধ্যে পা গলায়। তীব্র স্বরে বলে, 'আটকে পড়েছেন যে কিসে সে তো চোখের সামনে দেখতেই পেলাম। কিন্তু জীবনে কখনও ধারণা করিনি, আপনি আমাদের মাকে এইভাবে অপমান করবেন।'

'সোমা, সংযত হয়ে কথা কও।'

'না কইব না। কইতে পারছি না। বাবা—' সোমার ফেটে পড়া রাগ সহসা ফুটন্ত জল হয়ে চোখের স্নায়ুগুলো পুড়িয়ে দেয়, 'আপনার ছেলে, আপনার মেয়ে, আপনার সংসারের পবিত্রতা, সব কিছুর চেয়ে বড়ো হল ওই বিশ্রী—'

ও বেরিয়ে যাচ্ছিল। কমলাক্ষ ওর ওই ক্রুদ্ধা নাগিনীর মূর্তির দিকে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'তুমি যদি বিচারকের পোস্ট নিয়ে না আসতে সোমা, হয়তো তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতাম। হয়তো তখন আর তোমার বোঝা শক্ত হত না কোন্‌টা বড়ো কোন্‌টা ছোটো। অভিযোগ করে বসতে না তোমাদের মাকে আমি অপমান করছি।'

চলে যেতে উদ্যত সোমা ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজাটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে বলে, 'বেশ, তবে তাই বোঝান।'

কমলাক্ষ মাথা নেড়ে বলেন, 'আর হয় না। তুমি বোধ করি ফিরে গিয়ে তোমার শ্বশুরবাড়িতেই উঠবে? যদি তা না ওঠো, তো বলে রাখি—আমি কাল ফিরব। আর ওই ভদ্রমহিলা যাবেন আমার সঙ্গে।'

'এ আপনি কী করলেন?' লীলা রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করে।

কমলাক্ষ আস্তে বলেন, 'ঠিকই করলাম।'

'আর আপনার ঠিকের সঙ্গে যদি আমার 'ঠিক' না মেলে?'

কমলাক্ষ সেই 'সাধারণ—একেবারে সাধারণ' শীর্ণ মুখটার দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে তারপর বলেন, 'মেলাতেই হবে যে—'

লীলা সহসা ভিন্ন মূর্তি নেয়। রুক্ষস্বরে বলে, 'কিন্তু কেন বলুন তো? আমি আমার নিজের ব্যবসা নিয়ে নিজের জীবন নিয়ে পড়ে আছি, পড়ে থাকব। আপনার কী দরকার ভাবতে বসার—আমার অভিভাবক আছে কি না। আপনি কে? আপনার সর্দারী আমি নেবই বা কেন? যান আপনি কলকাতায় ফিরে যান আপনার মেয়ের সঙ্গে। এখনও ট্রেন ছাড়েনি, এখনও উপায় আছে।'

কমলাক্ষ মৃদু হেসে বলেন, 'না আর উপায় নেই।'

উপায় নেই। আর উপায় নেই।

কিন্তু লীলা কি পারবে না উপায় বার করতে? লীলা কি সম্মানের চাইতে সুখকে অধিক মূল্য দেবে? যে-স্বর্গে অধিকার নেই, সে-স্বর্গ শুধু দৈবাৎ হাতের মুঠোর কাছে এসে পড়েছে বলেই তাকে মুঠোয় চেপে ধরবে?

আর হতভাগা ব্রজেন ঘোষ? তাকে শুধু করুণাই করবে লীলা? সম্মান করবে না? সে তার জীবনপাত করে যে-আশ্রয় রচনা করে দিয়ে গেছে লীলার জন্যে, লীলা সে-আশ্রয়কে ভাঙা মাটির বাসনের মতো ফেলে দিয়ে চলে যাবে?

নাঃ, তা হয় না। লীলার সুখের মূল্যে অনেকগুলো সম্মান বিকিয়ে যাচ্ছিল, তা যেতে দেবে না লীলা। ব্রজেন ঘোষের সম্মান রক্ষা পাক, রক্ষা পাক কমলাক্ষর পরিচয়ের সম্মান, কমলাক্ষর সন্তানদের আর সংসারের সম্মান।

আর লীলার? নাঃ, তার আগে কিছুই রইল না। না সুখ, না সম্মান।

রইল শুধু ভাগ্যের তীক্ষ্ণ ধিক্কার! সে মুখ বাঁকিয়ে বলবে, 'ছি ছি! হীরের কৌটো এগিয়ে ধরলাম তোর দিকে, আর তুই হাত পিছিয়ে নিয়ে ভাঙা কাঁচের টুকরো খুঁইয়ে আঁচলে বাঁধলি?'

তাছাড়া? আরও এটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ অহরহ বিকৃত করবে না লীলাকে? বলবে না 'ভীরু! ভীরু!' বলবে না—'সাহস দেখে সাহস হল না তোমার?'

না, সাহস দেখে সাহস হল না লীলার। ভয় করল।

অথচ লীলা তো ভীরু ছিল না লীলার সাহস দেখে লোকে অবাক হত। লীলাকে কে ভাঙল? কে এমন দুর্বল করে দিল? তাই পালিয়ে গিয়ে সমস্যার সমাধান করতে বসেছে লীলা। সমাধানের আর কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

করুণাপদ ঘুম ভেঙে উঠে চোখ মুছতে মুছতে বলে, 'সে কি মা, এই মাঝরাত্তিরে আবার তুমি কোথায় পুজো দিতে যাবে?'

'যাব রে যাব—'। লীলা চুপি চুপি বলে, 'সে একটা দেবস্থান আছে, একেবারে ঊষাভোরে পুজো দিতে হয়। এখন থেকে না বেরোলে—দূর তো অনেকটাই—'

'তা সাতজন্মে তো তোমায় এমন উন্মাদ হয়ে 'দেবস্থান' দেখতে যেতে দেখিনি মা? হঠাৎ আবার কি হল তোমার?'

লীলা বলে, 'চুপ আস্তে আস্তে। মুখুজ্জেবাবুর ঘুম ভেঙে যাবে। পুজো দিচ্ছি—তোর অসুখের সময় মানসিক করেছিলাম বলে। যাক, তুই দোরটা দে।'

করুণাপদ কাতর কণ্ঠে বলে, 'আমার আবার অসুখ, তার আবার মানসিক! আমি একটা মনিষ্যি! তা কাল আমায় কিছু বললে না—এখন হঠাৎ রাত না পোয়াতে বলছ, দোর দে, আমি যাই। একা যাবে তুমি? তাই কখনও হয়?'

লীলা ব্যস্তভাবে বলে, 'হয় হয় খুব হয়। আজ 'যোগ' যে! কত লোক যাচ্ছে! তুই সুদ্ধু চলে গেলে মুখুজ্জেবাবুর খাওয়া-দাওয়ার কী হবে? ভাবছিস কেন? মরে যাব? এত কাণ্ডতেও যখন তোর মা ঠিক অটুট থাকল করুণাপদ, তখন একা দেবস্থানে যেতে মরে যাবে না। দে তুই দোর দে। দিয়ে আরও খানিক শুগে যা। এখনও ফরসা হতে দেরি আছে। মানসিক শুধতে যাচ্ছি, বাধা দিসনে। পিছু ডাকলে দোষ হয়।'

'তা বেশ, ডাকছি না। ফিরবে কখন সেটা শুনি?'

'ওই যেতে আসতে যা সময় লাগবে!' সিল্কের চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে অস্ফুট আলোর চাদর গায়ে দেওয়া রাস্তায় হন হন করে এগিয়ে চলে লীলা।

যতক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে থেকে, আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে বসে করুণাপদ। দেবদ্বিজে এত ভক্তি আর কবে দেখেছে লীলার?

এই লক্ষ্মীছাড়া করুণাপদর এতখানি মূল্য? তার অসুখে মানসিক করতে হয়, আবার সে-মানসিক শোধ করতে লীলাকে যেতে হয় ঊষাভোরে পায়ে হেঁটে?

চোখে জল এল করুণাপদর।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন কমলাক্ষ। চোখে ঘুম এল প্রায় শেষ রাত্রে। এল তো বড়ো গভীরই এল।

ভোর রাত্তিরের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে বয়ে চলেছিল ঘরের মশারি উড়িয়ে, আলনায় ঝোলানো জামাকাপড় দুলিয়ে।

রাত্রিজাগা ক্লান্ত দেহে এ হাওয়া যেন একটা নেশার জাদু বুলিয়ে দিল। সে-নেশার আচ্ছন্নতা কাটতে রোদ উঠে গেল সকালের।

করুণাপদর ডাকেই বোধ হয় ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। দেখলেন গলানো রুপোর স্রোত—ঘরের মেঝেয়, বিছানায়, মশারিতে, মাঠে আকাশে।

বললেন, 'সর্বনাশ! কত বেলা!'

করুণাপদ বলল, 'হ্যাঁ, বেলা দেখেই ডেকে দিলাম বাবু। মা বাড়ি নেই, আপনিও ঘুমোচ্ছেন, প্রাণটা কেমন করতে লাগল। তাই বলি ডেকে দিই—'

কমলাক্ষ অবাক হয়ে বললেন, 'মা বাড়ি নেই!'

'আজ্ঞে না। সেই শেষ রাত্তিরে উঠে দেবস্থান গেছেন মানসিক শুধতে। কপাল করুণাপদর! তার জীবন আবার জীবন! তার সেই জীবনের জন্যে মানসিক করা, তার জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে যাওয়া—'

কমলাক্ষ হতাশ গলায় বলেন, 'আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না করুণাপদ।'

করুণাপদ বলে, 'বুঝতে কি আমিই পেরেছি বাবু? আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, করুণাপদ দোরটা দে, আমি একটু পুজো দিতে যাব। যত জেরা করি তত বলেন, চুপ চুপ! মানে আর কি

আপনার ঘুম ভাঙার ভয়ে—তা এসে যাবেন বোধ হয় বিকেলের মধ্যে। শুনছি আজ যোগ, যাবে অনেকে। মুখটা ধুয়ে নিন বাবু, চায়ের জল চাপিয়েছি।'

মুখুজ্জেবাবু না থাকলে যে করুণাপদও সেই অজানা দেবস্থানটা দেখে আসতে পারত সেই কথা ভাবতে ভাবতে যায় করুণাপদ। মানুষটা বড়ো গোলমেলে।

একমাসের কড়ারে এসেছিল, তার মধ্যে কত কাণ্ডই ঘটে গেল। কাল আবার বাবুর মেয়ে এসে বকাবকি করে গেল। চলে গেলেই হত। করুণাপদ মায়ের তলায় তলায় থেকে হোটেলটা ঠিকই চালিয়ে যেত। উনি আবার এখন কত ফ্যাচাঙের কথা কইছেন। আরে বাবা, আমরা অভিভাবকশূন্য হলাম তা তোর কি? তুই যদি এ-সময় না আসতিস পলাশপুরে?

কমলাক্ষ যদি না আসতেন পলাশপুরে? এই সময় নয়, কোনো সময় নয়? জীবনে তো কখনও পলাশপুরের নামও শোনেননি কমলাক্ষ। কোন্ গ্রহের চক্রান্তে—কিন্তু গ্রহের চক্রান্ত কি কমলাক্ষর? না লীলার?

অদ্ভুত একটা ইতিহাস নিয়ে অদ্ভুত একরকম জীবনযাপন করছিল যে-লীলা এই অখ্যাত অবজ্ঞাত জায়গাটায়? কমলাক্ষই কি তার জীবনে কুগ্রহের মূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন না? কমলাক্ষ না এলে হয়তো ব্রজেন ঘোষ টিঁকে থাকত। হয়তো তাহলে লীলা তাকে মদ খাবার পয়সা দিত।

হয়তো বাড়িতে একটা ভদ্রলোক রয়েছে বলেই ব্রজেন ঘোষকে শাসন করতে গিয়েছিল লীলা। কমলাক্ষ না এলে হয়তো এসব কিছুই হত না।

আর কমলাক্ষর নিজের? এখানে না এলে কমলাক্ষই কি জীবনে কখনও জানতে পারতেন জীবনের সত্য কি?

চিঠিখানা আর একবার চোখের সামনে তুলে ধরলেন কমলাক্ষ। চিঠি নয়, কাগজের একটু টুকরো। যে টুকরোটুকু কমলাক্ষর মশারির তলায় গোঁজা ছিল।

'মিথ্যে একটা বন্ধনে জড়িত হয়ে জীবনকে জটিল করে তুলবেন না। চলে যান, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। ভগবানের বিধানে কত শত বন্ধন মুহূর্তে ছিঁড়ে পড়ে, তাও তো সহ্য করে নিতে হয় মানুষকে? এও না হয় সেইরকমই মনে করুন। মানুষের গড়া সমাজও তো দ্বিতীয় ভগবান।'

ভাববেন না—'প্রবাসে আবাস' আবার চলবে পুরনো নিয়মে। খদ্দেররা যথারীতিই যত্ন পাবে, অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবে না। আর আমাকে দেখা-শোনা? তাতেও নিশ্চিন্ত করেই রাখি। শুনুন, যদি শরণ নিই তা হলে ওই গগন গাঙুলীরাই দেখবেন। তাই নেওয়াই ভালো নয় কি?

তাইতো আমাদের দ্বিতীয় ভগবানের নিয়ম। বেরোবার সময়টা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছি, তাতে ভীরু বলুন আর যাই বলুন। আজই কিন্তু চলে যাওয়া চাই। আর শুনুন—মনে করবেন না কিছু, ছুটিছাটা হলে আর যেন ভুলে কখনও পলাশপুরের টিকিট কেটে বসবেন না।'

—ঃ ঃ—